বিদেশী সাংবাদিকের দৃষ্টিতে

শেখ মুজিবের বাংলাদেশ

বিদেশী সাংবাদিকদের দৃষ্টিতে

শেখ মুজিবের বাংলাদেশ

হাসনাত করিম সম্পাদিত

ক্রিয়েটিভ পাবলিসার্স

www.pathagar.com

বিদেশী সাংবাদিকদের দৃষ্টিতে
শেখ মুজিবের বাংলাদেশ
হাসনাত করিম সম্পাদিত

প্রকাশক :
ক্রিয়েটিভ পাবলিসার্স
৪০/এ বাংলাবাজার
ঢাকা-১০০০

প্রথম প্রকাশ :
আগস্ট, ১৯৭৯
শ্রাবণ, ১৩৮৬

দ্বিতীয় প্রকাশ :
ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২
ফাল্গুন, ১৩৯৮

তৃতীয় প্রকাশ :
ডিসেম্বর, ২০০৯
অগ্রহায়ণ, ১৪১৬

প্রচ্ছদ :
আসিফুল হুদা

বর্ণ সংযোজন :
এসএম শফিউল ইসলাম

মূল্য : ৫০ টাকা

BIDESHI SHANGBADIKDER DRISHTITE
SHAIKH MUJIBER BANGLADESH
(Opinion Of The International Press On Bangladesh Under the Regime Of Shaikh Mujibur Rahman)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বাংলাদেশের জনগণ বহু রক্ত ও ত্যাগের বদলে স্বাধীনতা অর্জন করেন। কিন্তু স্বাধীন দেশের নেতৃত্বদানে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয় আওয়ামী লীগ সরকার। অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র যত্রতত্র ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দেশে নাগরিক শাসন বা গণতন্ত্র হয়ে পড়ে বিপন্ন। দেশে যখন প্রয়োজন ছিল ঐকমত্যের ভিত্তিতে মিলন ও সমঝোতার সাথে জাতি গঠনের মহাকার্যক্রম সূচনা করা, তখন প্রতিহিংসামূলক ও বিশেষ একটি আদর্শকে দাবিয়ে রাখার জন্যে প্রণীত আইন দ্বারা জাতির বিবেককে খণ্ডিত করা হলো। বহুদলীয় গণতন্ত্রের দাবিতেই যে দেশ স্বাধীন হয়, সে দেশেই শাসক দল আওয়ামী লীগ চালু করে রাজনৈতিক একচেটিয়া কারবার। পরমতসহিষ্ণুতার অভাব থেকেই জন্ম নেয় বিচিত্র দমনমূলক ব্যবস্থা; সৃষ্টি করা হয় রক্ষীবাহিনী।

আওয়ামী লীগ সরকার আমলে দেশের অর্থনীতি দুইভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। প্রথমতঃ দলীয়করণ বা লুটপাট; দ্বিতীয়তঃ সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের নামে এক গভীর নীলনকশা মোতাবেক দেশের অর্থনীতির সর্বনাশ সাধন করা। স্বাধীনতা পরবর্তী বছরগুলোতে স্বাভাবিক মৃত্যুর কোনো গ্যারান্টি ছিল না। মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ (১৯৭৪) স্বাধীনতা ও মানবতা উভয়কেই ব্যঙ্গ করেছিল।

রাজনৈতিকভাবে শেখ মুজিব তার বহুল বিঘোষিত গণতন্ত্র থেকে দিন দিন পিঠটান দিতে থাকেন। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী এনে গণতন্ত্র দাফন দিয়ে তিনি দেশে প্রবর্তন করেন একদলীয় স্বৈরাচার। সর্বপ্রকার অধিকার এমনকি বিচার প্রার্থনার অধিকারও হারিয়ে মানুষ হয়ে পড়ে ক্রীতদাস। মৌলিক অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সবকিছু হারিয়ে একটি রক্তার্জিত প্রজাতন্ত্র বিংশ শতাব্দীর এক অলীক রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হয়।

অষ্টম শতাব্দী থেকেই মুসলিম সংখ্যাগুরু এই দেশে ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। এই উপমহাদেশেও প্রথম জাগৃতি (রেনো) আনে পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত নবীন বিশ্বাস ইসলাম, অথচ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের এই দেশে ইসলামকে আইন করে রাষ্ট্রজীবন থেকে খারিজ করা হয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীন ও স্বকীয় জাতিসত্তা বিকাশের বদলে চালিয়ে দেয়া হয় বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ।

স্বাধীনতা সংগ্রামে মৌলিক ভূমিকার গর্বিত দাবিদার যে দল, কেন তাদের হাতেই সোনার দেশ এমন শ্মশানে পরিণত হলো, সে প্রশ্নের উত্তরই এ বইটিতে মিলবে। তবে ব্যতিক্রম এই যে, এখানে আমরা কোনো একটি শব্দও লিখিনি, একটি অক্ষরও বসাইনি। এখানে পত্রস্থ করেছি বিদেশী সাংবাদিকরা ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের ওপর যে রিপোর্ট লিখেছেন এবং ছাপা হয়েছে তার হুবহু বাংলা

www.pathagar.com

রূপান্তর। হুবহু তথা আক্ষরিক অনুবাদ করতে গিয়ে জায়গায় জায়গায় বক্তব্যে সাবলীলতা হারিয়েছে। এগুলো পরিহার করার কোনো উপায় ছিল না। বইটির প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৭৯ সালের ১ আগস্ট। দ্বিতীয় সংস্করণের এই তাগিদই আমাদেরকে বলে দিচ্ছে মানুষ নিরপেক্ষ তৃতীয়পক্ষের মত শুনতে আগ্রহী।

খন্দকার হাসনাত করিম
১ ফেব্রুয়ারি '৯২
'মমতাজ মহল', সাঁতারকুল, ঢাকা।

www.pathagar.com

সম্পাদকের কথা

শেখ মুজিবকে যারা নিকট থেকে দেখেছেন তাদের মতে মুজিব বরাবরই একনায়কত্ববাদী, ডিক্টেটর মানসিকতায় পুষ্ট ছিলেন।

যে কারণে ১৯৭২ এর ১০ জানুয়ারি পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে মুজিব স্বৈরাচারী মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। তার যখন দায়িত্ব ছিল জাতীয় পুনর্গঠনে ব্রতী হওয়া তখন মুজিবের দুর্নীতিবাজ প্রশাসন এবং লুটেরা-সাঙ্গোপাঙ্গরা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সচ্ছল অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিল। প্রায় প্রতিটি দেশই এ ধরনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সর্বস্বান্ত হয়– কিন্তু এটা একমাত্র বাংলাদেশ যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামোকে মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া গিয়েছিল। যদিও, প্রথম লুণ্ঠনের সূত্রপাত ভারতীয় সেনাবাহিনীই শুরু করে।

পরবর্তী বছরগুলো বাংলাদেশীদের জন্য একটা দুঃসময় পার হতে থাকল। একদিকে মুদ্রাস্ফীতি, দেউলিয়া অর্থনীতি, দুর্ভিক্ষ, অপরদিকে সীমাহীন লুটপাটের রাজনৈতিক লাইসেন্স। সারা দুনিয়া ত্রাণকার্যে ছুটে এসেছিল। কিন্তু ত্রাণ-সামগ্রীর বদৌলতে ভাগ্যবান হয়েছে আওয়ামী লীগের সদস্যরা। দুঃস্থ মানবতার তাতে কোনো উপকার হয়নি।

রাজনৈতিকভাবে মুজিব তার বহুল বিঘোষিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে দিনে দিনে পিঠটান দিচ্ছিলেন। প্রতিবাদে অসহিষ্ণু মুজিব স্বীয় ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য সৃষ্টি করলেন রক্ষীবাহিনী। ভারতীয় সমর বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত যে বাহিনীর নির্যাতনের কথা আজো প্রতিটি বাংলাদেশীর মনে ভীতির সঞ্চার করে। সবশেষে '৭২ সালের সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি এক শ্বাসরুদ্ধকর একদলীয় শাসন চালু করলেন। মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো মানুষ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হলো খর্বিত, রহিত হলো বিচার বিভাগের সার্বভৌমত্ব। মুজিব তার বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যার হুকুম দেন। সিরাজ শিকদারের নির্মম মৃত্যু তার স্বাক্ষর বহন করছে।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই ৮৫% মুসলমান জনঅধ্যুষিত এই দেশে ইসলাম সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনকে প্রভাবিত করে আসছে। বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামেরও দুর্গ ছিল এই বাংলাদেশ। ধর্মানুরাগী মুসলমানদের এই দেশে মুজিব তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে অপসারিত করলেন এবং সমগ্র ইতিহাসকে উপেক্ষা করে চাপিয়ে দিলেন 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের' এক সুপরিকল্পিত অধ্যায়।

মুজিবের পতনের মধ্যদিয়ে একদলীয় স্বৈরশাসন এবং সম্প্রসারণবাদী ভারতের সেবাদাসত্বের সীমাহীন রাজনৈতিক অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছিল। কিন্তু সে ভুল জাতীয় জীবনে আবার পুনর্বাসিত হতে চলেছে। সেই কুখ্যাত গণদুষমন আওয়ামী পাণ্ডবেরা আবার আস্ফালন শুরু করেছে। পরিবর্তনের পর যারা ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে এ দেশের বুকে

www.pathagar.com

বন্দুক ধরেছিল তারা আজ মুক্ত-বিহঙ্গ। তারা আজ দৃঢ়তার সাথে একথা উচ্চারণ করছে যে, 'বাকশাল আমাদের গৌরব'। বর্তমান নেতৃত্বের কথা ও কাজে অসঙ্গতি এদেরকে পুনরায় আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। এই সংকটময় মুহূর্তে শেখ মুজিব ও তার আওয়ামী লীগের দুঃশাসন এবং বিশ্বাসঘাতকতার কথা মনে পড়ার দরকার আছে। আমরা তাই বিদেশী পত্র-পত্রিকা এবং ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতারা শেখ মুজিবের বাংলাদেশ সম্পর্কে যে প্রতিবেদন তুলে ধরেছিলেন তা মুলতঃ আক্ষরিক অনুবাদ। তাই অনেক জায়গায় বক্তব্য সাবলীলতা হারিয়েছে, অনেক জায়গায় অস্বচ্ছতা দেখা দিয়েছে। এই অনতিক্রম ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

হাসনাত করিম
ঢাকা
১লা আগস্ট ১৯৭৯

www.pathagar.com

এ একজনের কাহিনী নয়

লুই সিমনস, লন্ডন গার্ডিয়ান

সীমাহীন আওয়ামী লুটপাটে মুখ থুবড়ে পড়ে স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতার নাম ভয়াল দুর্ভিক্ষ। স্বাধীনতার নাম আওয়ামী হেরেমের বিলাশ, নৃত্য আর রাজপথে না থেকে পাওয়া অগণন মানুষের মৃত্যু আর লাশের মিছিল। এই মিছিলের প্রতীক মানিকগঞ্জের আলীমুদ্দিন। সুদূর লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকার লুই সিমনস আলমুদ্দিনকে প্রকাশ করেন বিশ্ব দরবারে। ১৯৭৪ সালের ৩০ মার্চ 'এ একজনের কাহিনী নয়' শিরোনামে আওয়ামী সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের চিত্র ফুটে উঠে।

আলীমুদ্দিন ছাতা মেরামতের কাজ করে। এ সময়টা তার জন্য ব্যস্ততার মৌসুম। রোজ বিকেলে বঙ্গোপসাগরের কালো মেঘ পদ্মার উপর দিয়ে ভেসে যায়, আর মানিকগঞ্জে মুষলধারে বৃষ্টি নামে।

শহরের প্রধান বাজারের রাস্তায় আলীমুদ্দিন এক পায়ের ওপর আর এক পা আড়াআড়িভাবে রেখে বসে ছেঁড়া ছাতা সেলাই করে, জোড়াতালি দেয় এবং ছাতার সিক মেরামত করে। সাইড বিজনেস হিসেবে পুরান তালা মেরামত করে, পুরান চাবিও সরবরাহ করে।

এমন মৌসুমেও আলীমুদ্দিন ক্ষুধার্ত। বলল, "যেদিন বেশি কাজ মেলে, সেদিন এক বেলা ভাত খাই। যেদিন তেমন কাজ পাই না সেদিন ভাতের বদলে একটা চাপাতি খাই। আর এমন অনেক দিন যায় যেদিন কিছুই খেতে পাই না।"

তার দিকে এক নজর তাকালেই বুঝা যায়, সে সত্যি কথাই বলছে। সবুজ লুঙ্গির নীচে তার পা দুটিতে মাংস আছে বলে মনে হয় না। আলীমুদ্দিন যে ছাতা মেরামত করে, সেই ছাতার মতোই তার নিজের পাঁজর ও মেরুদণ্ড বের হয়ে আছে।

ঢাকার ৪০ মাইল উত্তরে মহকুমা শহর মানিকগঞ্জ। ১৫ হাজার লোকের বসতি। তাদের মধ্যে আলীমুদ্দিনের মতো আরো অনেকে আছে। কোথাও একজন মোটা মানুষ চোখে পড়ে না। কালু বিশ্বাস বলল, "আমাদের মেয়েরা লজ্জায় বের হয় না– তারা অর্ধনগ্ন।"

মানিকগঞ্জে এ অবস্থা কেন? মানুষের খাবার নেই, কাপড় নেই। "মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। চাল-ডাল কেনার সামর্থ্য কারো নেই। সরকার বলেছিল আজাদীর পর সুদিন আসবে। আমার ভাই মুক্তিযুদ্ধে মারা গেছে। আমি আমার এই পা হারিয়েছি। সরকার কিছুই করে নাই"– কথাগুলো বলল মনসুর আলী। মনসুর আলী একজন চাষী। বয়স পঁয়তাল্লিশ। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে গেরিলা হয়ে লড়েছে। একটা পা হারিয়েছে।

বাঁশের ক্র্যাচ ও লাঠির মাঝে দেহের সমতা রাখতে গিয়ে মনসুর আলীর হাত কাঁপছিল। ঘাড়ে ঝুলানো জীর্ণ থলি থেকে লাল সুতায় বাঁধা, শত হাতের ছোঁয়ায় বিবর্ণ একটা কাগজ বের করে দেখাল। শিরোনামায় লেখা রয়েছে 'প্রধানমন্ত্রীর রিলিফ ও ওয়েলফেয়ার ফান্ড'।

মনসুর আলী বলল, শহরের সরকারি কর্মচারীরা তাকে বলেছে, "এ ফান্ড থেকে টাকা পাওয়ার কথা ভুলে যাও।" সে অভিযোগ করল, "আমি ভিক্ষুক নই, কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে খাবার ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়েছি। নইলে আমি মরে যাব।"

আলীমুদ্দিনের কাহিনী গোটা মানিকগঞ্জের কাহিনী, বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষের কাহিনী, শত শত শহর-বন্দরের কাহিনী এ পর্যন্ত বিদেশ থেকে ৫০ লাখ টনেরও বেশি খাদ্যশস্য বাংলাদেশে পাঠান হয়েছে। কিন্তু যাদের জন্য পাঠান হয়েছে তারাই পায়নি। খাদ্যদ্রব্য ও জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব বেড়ে গেছে কিন্তু লোকের আয় বাড়েনি, বরং কমেছে।

আবদুল হাদীর মতো মধ্যবিত্ত লোকদেরও একই কাহিনী। হাদী স্থানীয় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের একাউন্টেন্ট। মাসিক উপার্জন তার ১৬ পাউন্ডের সামান্য বেশি। হাদীর বয়স তিরিশ। বিবাহিত। তার তিনটি শিশু-সন্তান আছে। ব্যাংকের সামনে কর্দমাক্ত রাস্তার ওপাশে একটি করোগেটেড শেডের এক অংশে হাদী সপরিবারে বাস করেন। খাওয়া-দাওয়া ও বাসা ভাড়া বাবদ যা খরচ হয় তা তার উপার্জনের দ্বিগুণ। হাদী বললেন, "এভাবে আর কতদিন চলবে জানি না।"

মানিকগঞ্জের প্রায় সকলের মতো হাদীও গত মার্চ মাসের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এখন হাদী বলতে লাগলেন, "রেশনের দোকানেও কিছু পাওয়া যায় না। ওদিকে সরকারি মহলে অর্থের একটানা অপব্যয় চলছে। আগামী নির্বাচনে যে কেউ ভাত-কাপড় দিতে পারবে তাকেই ভোট দেব।" হাদীর হিসাব মতো মানিকগঞ্জে মুজিবের সমর্থন শতকরা ৬০ ভাগ কমে গেছে। বাংলাদেশে যে এতো বিপুল পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী পাঠান হয়েছে, তার কি হলো? "কি হয়েছে তা সকলেই জানে। সব ভারতে পাচার হয়ে গেছে।" হাদী জবাব দিলেন।

সর্বত্রই শোনা যায় যে, প্রচুর পরিমাণ গম ও চাল ভারতে পাচার হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর আট/দশ মাস পর্যন্ত ধারণা করা হতো যে, স্থানীয় রাজনৈতিক চাঁইরা রিলিফের গম ও চাল আত্মসাৎ করে কালোবাজারে বিক্রি করেন। এখন এসব কালোবাজার পর্যন্ত পৌঁছায় না, পথেই উধাও হয়ে যায়।

www.pathagar.com

বিদেশ থেকে যে খাদ্যশস্য আসে, তা চাটগাঁ বন্দরে তদারক করে জাতিসংঘের বাংলাদেশস্থ রিলিফ অফিস। যেই মাত্র জাহাজ থেকে খাদ্যশস্য, ময়দা, চিনি, রান্নার তেল ইত্যাদি নামান হলো, অমনি তাদের তদারকি শেষ হয়ে গেল। বিতরণ ব্যবস্থার কর্তৃত্ব বাংলাদেশ সরকারের হাতে। শেখ মুজিব অভ্যন্তরীণ বিলি-বণ্টনে বিদেশীদের তদারকি বরদাশত করতে রাজি নন। যদিও বিতরণের সুবিধার জন্য জাতিসংঘই বাংলাদেশ সরকারকে ৭২৩টি লরী খয়রাত দিয়েছে। এসব লরীর কয়েকশ' ঢাকা ও চাটগাঁর রাস্তায় পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। অনেক রাজনীতিবিদ ও তাদের পরিবারের সদস্যরা ব্যক্তিগত বাহন হিসেবেও সেগুলো ব্যবহার করছেন।

চাটগাঁয়ের গুদাম থেকে খাদ্যসামগ্রী দেশের অভ্যন্তরে নারায়ণগঞ্জ ও খুলনা বন্দরে আনীত হয়। সেখান থেকে তা গরুর গাড়ী, লরী, ট্রেন ও ছোট ছোট নৌকায় করে স্থানীয় সরবরাহ ডিপোতে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই পর্যায়েই বিতরণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। প্রাইভেট ডিলাররা তাদের বরাদ্দ ঠিকই নেয় কিন্তু রেশনের দোকানগুলোতে সম্ভবতঃ অর্ধেক মাত্র সরবরাহ করে। খাতাপত্রে কিন্তু দেখায় যে পুরা সাপ্লাই দেয়া হয়েছে। বাদবাকী খাদ্যশস্য তারা সীমান্তের ওপারে পাচার করে দেয়।

বিদেশ থেকে সাহায্যস্বরূপ যে চাল ও গম আসে, সরকার যা ক্রয় করেন এবং দেশে যা উৎপন্ন হয়, সব মিলে দেশের সকল মানুষের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার তিক্ততম পরিহাস এই যে, যাদের প্রয়োজন তারাই পায় না।

www.pathagar.com

দেউলিয়া হতে চলেছে

ওয়ার্নার এ্যাডাম, ফ্র্যাংকফুর্ট এলজেমাইন

নতজানু পররাষ্ট্রনীতি, বিশেষ করে ভারতের সেবাদাসবৃত্তি চরিতার্থ করার লক্ষ্যে আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী সর্বদা সক্রিয় থাকতো। তাই ফারাক্কা বাঁধে গঙ্গার পানি প্রত্যাহার করে বাংলাদেশকে বন্যায় ভাসিয়ে দিতে ভারতের চক্রান্ত নিয়ে কোনো কথা তখন বলা হয়নি। এই ব্যর্থতাকেই তুলে ধরেছেন সাবেক পশ্চিম জার্মানীর ফ্র্যাংকফুর্টার এলজেমাইন পত্রিকার ওয়ার্নার এ্যাডাম। ২০ আগস্ট '৭৪ তারিখে এটি প্রকাশিত হয়।

স্বাধীনতার পর বত্রিশ মাসে আমরা যা কিছু করেছি, বন্যা এসে সব ধ্বংস করে দিয়েছে।' দুঃখ করে বললেন– বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। তার মতে, বন্যা পাকিস্তানের পঁচিশ বছরের অবহেলার ফল ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি তীব্রভাবে অস্বীকার করেন যে, বাংলাদেশ বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও অধিকাংশ পর্যবেক্ষকই এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। উপরন্তু শেখ মুজিব ফের আশা করছেন যে, বহির্বিশ্ব বাংলাদেশের জাতীয় বিপর্যয়ে সঠিকভাবে সাড়া দেবে। গত দুই বছরে কমপক্ষে ৩ হাজার ৫ শত মিলিয়ন মার্ক সাহায্য দেবার পরও উন্নতির কোনো লক্ষণ না দেখে বহির্বিশ্বের ক্রমশঃই ধারণা হচ্ছে যে, বাংলাদেশ একটা 'তলাবিহীন পিপে'। সে যাই হোক, ১৯৭০ সালের প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সময় এবং বার মাস পরে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙ্গালীদের আবেদন দুনিয়া জুড়ে যে সাড়া জাগিয়েছিল, সে তুলনায় এবারকার বন্যা পরিস্থিতিতে বিদেশী সাহায্য নেহাৎ নগণ্য। এ সময়ে জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য ঢাকা যেখানে বৈদেশিক মুদ্রায় ৭৯৩ মিলিয়ন জার্মান মার্ক ও আরো ৩৯৩ মিলিয়ন জার্মান মার্কের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে, সেখানে আজ পর্যন্ত দ্রব্যাদিসহ ২৫ মিলিয়ন মার্কও এসে পৌঁছেনি। একই সময় এই ধারণাও দৃঢ়তর হচ্ছে যে, বাংলাদেশ সরকার নিজেদের অক্ষমতা ঢাকবার জন্য 'স্কেপ গোট' খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং বিশেষ করে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার ওপর তাদের নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পাচ্ছে।

অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, সরকার এ বছরের বন্যার ক্ষয়ক্ষতির যে হিসাব দিয়েছে, তা চলতি বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনার ঘাটতির প্রায় সমান। প্রকাশ থাকে যে, সে ঘাটতি অর্থ দফতর যে কোনোভাবে বৈদেশিক সাহায্যে পূরণ করতে চেয়েছিল।

বন্যায় আক্রান্ত হওয়ার আগেই বাংলাদেশে দেউলিয়াপনার ছায়া দেখা যাচ্ছিল। অধিকন্তু এটা সত্য যে, গত জুন মাস থেকেই বাংলাদেশ স্টেট ব্যাংকের গ্যারান্টি সত্ত্বেও বিদেশী ব্যাংকগুলো 'লেটার অব ক্রেডিট' প্রত্যাখ্যান করে আসছে। এককথায় বাংলাদেশ সরকার যদি বিদেশে এ বিশ্বাস জন্মাতে অপারগ হয় যে, ভবিষ্যতে বৈদেশিক সাহায্যের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা আরো ব্যাপক হবে, তাহলে দেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে দেউলিয়াপনার দিকে এগিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

মিথ্যা আর দুর্নীতি বেড়েই চলেছে

কার্লোস উইগম, টজেস আর্জগার

আওয়ামী চাটুকাররা রিলিফ মারছে। মরছে নিরন্ন মানুষ। রিলিফ ওরা মারবেই বা না কেনো। ওদের ক্ষমতার ভিত্তিতো মিথ্যার বেসাতী আর সীমাহীন দুর্নীতি। জুরিখ থেকে প্রকাশিত টজেস আর্জগার পত্রিকায় '৭৪-এর ২৯ আগস্ট এ বিষয়ে লিখেছেন কার্লোস উইগম।

প্রতি সপ্তাহে বাংলাদেশ থেকে ভয়াবহ খবর আসে। আমরা আমাদের এশীয় সংবাদদাতা মি. কার্লোস উইগমকে 'এশিয়ার পর্ণ কুটীরে' পাঠিয়েছিলাম। সেখানকার পরিস্থিতির তিনি যে মূল্যায়ন করেছেন তা অত্যন্ত ভীতিপ্রদঃ লোভী বাংলাদেশ সরকারের কর্তারা বন্যাপীড়িত লোকের জন্য দেয়া আন্তর্জাতিক খয়রাত আত্মসাৎ করে মোটা হচ্ছেন। সাহায্যকারী দেশগুলো এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, ফলে তারা আর সাহায্য দিতে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু এদিকে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ প্রতিদিন গরীব থেকে আরো গরীব হচ্ছে।

এমনকি আদর্শবাদীরাও বাংলাদেশ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। প্রথমদিকে বাংলাদেশ সরকারের হিসাব বন্যায় মৃতের সংখ্যা ছিল ২০০০। এখন তা নেমে ১,৭০০তে দাঁড়িয়েছে। এই বিভ্রান্তিকর তথ্যের জন্য কারো কারো মুখে মন্তব্য শোনা যাচ্ছে যে, তারা ঠিক জায়গামতো কমা বসিয়েছিলেন কি না? আরো সন্দেহ করা হয় যে, বন্যা পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে দেখিয়ে বেশি সাহায্য আদায়ের উদ্দেশ্যে সরকারি হিসাব বাড়িয়ে তোলা হয়েছিল। তবে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহ এই বিষয় বেশ সচেতন। ফলে পুরান প্রবাদটিরই পুনরাবৃত্তি চলছেঃ "বাঙ্গালীদের মাথা আকাশে, পা ধুলায় ও হাত অপরের পকেটে"।

এ ব্যাপারে কারোর সন্দেহ নেই যে, দুর্ভিক্ষ সামলাবার জন্য বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু সাহায্যকারী দেশগুলোর ধারণা এই যে, বন্যার অজুহাতে বাংলাদেশ সরকার অধিকতর খয়রাত আদায় করে নিজেদের দুর্নীতির খোরাক যোগাতে চাচ্ছে।

যদিও বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের শেষ নাগাদ প্রায় ৪ হাজার মিলিয়ন ফ্রাংক সাহায্য পেয়েছে (এ সময়ে এতোবেশি সাহায্য আর কোনো উন্নয়নশীল দেশ কখনো পায়নি)। তবুও সরকার বন্যা প্রতিরোধকল্পে কোনো টাকাই বরাদ্দ করেনি। এক কোটি বেকার বাঙ্গালীকে মাটির বাঁধ তৈরি, খাল খনন প্রভৃতি ফলপ্রসূ কাজে নিয়োজিত করা যেত। এভাবে চীন ও ভারতে কাজ হয়েছে।

'নিজের সাহায্যের জন্য নিজেও সাহায্য কর'–একথা বাংলাদেশে অর্থহীন। কেননা,

www.pathagar.com

যতো সাহায্য এসেছে তা আওয়ামী লীগ নেতাদের ব্যক্তিগত পকেটে গিয়েছে। মিঃ টনি হেগেন– যিনি বাংলাদেশে জাতিসংঘের দেয়া সাহায্যের চার্জে ছিলেন– প্রকাশ করেছিলেন যে, যাবতীয় খয়রাতি শিশুখাদ্য ও কম্বলের অতি অল্পই ঠিক জায়গায় পৌঁছেছে। বাদবাকী কালোবাজারে বিক্রি হয়েছে অথবা পাচার হয়ে ভারতে চলে গেছে। সে অবস্থার আজো পরিবর্তন হয়নি। ঢাকার সংবাদপত্রে যখন ঘোষণা করা হলো যে, বন্যাপীড়িতদের জন্য এক উড়োজাহাজ ভর্তি গুঁড়োদুধ বিমানবন্দরে আসছে, ঠিক তার পরদিনই ঢাকার হোটেল ম্যানেজাররা ওগুলো কিনতে বাজারে তাদের লোক পাঠিয়ে দিলেন। বস্তুতঃ এইভাবেই বাংলাদেশে বন্যার্তদের জন্য দেয়া সাহায্য বিতরণ করা হয়ে থাকে।

যে সরকার শিয়ালকে হাঁস পাহারা দিতে দিয়েছেন, অর্থাৎ যে সরকার কুখ্যাত জোচ্চোর (দেশে ও বিদেশে) গাজী গোলাম মোস্তফাকে জাতীয় রেডক্রসের সভাপতি নিযুক্ত করেছেন, সে সরকার সম্পর্কে কোনো কিছুতেই বিস্ময় হওয়ার কিছু নেই। মোস্তফা এ পদ পেয়েছেন, যেহেতু তিনি শুধু গুঁড়োদুধই কালোবাজারে বিক্রি করেননি, অনেক ওষুধপত্রও আত্মসাৎ করেছেন। বাংলাদেশ রেডক্রসের সভাপতি এখন ৩৭টি ওষুধের দোকানের মালিক।

এ ধরনের বিবেকবর্জিত কাজের ফল চাক্ষুষ দেখতে হলে ৩ মাইল দূরে পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়া স্কুলে যাওয়া যেতে পারে। স্কুলটি এখন বন্যায় ঘর–বাড়ি হারিয়েছে এমন দুই হাজার পাঁচশ লোকের আশ্রয়স্থল। সারি সারি কংকালসার শিশু শুয়ে আছে– এতো দুর্বল যে, ওদের কাঁদবার শক্তিটুকুও লোপ পেয়েছে।

ক্যাম্প–এর পরিচালককে জিজ্ঞাসা করা হলো, সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে তিনি কিছু পেয়েছেন কি না? তিনি জবাব দিলেন ঃ "পেয়েছি– জাতীয় রেডক্রসের কাছে থেকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তা কাজে আসেনি। যে দুটি সুইডিশ বিস্কুটের ও একটি ফরাসী শিশুখাদ্যের বাক্স রেডক্রস দিয়েছিলেন, তা কীট আর পোকায় ভর্তি ছিল। এসব খাদ্য গত কালকের উড়োজাহাজে আসেনি। ১৯৭০ সালের বিপর্যয়ের সময় থেকেই এগুলো গুদামজাত হয়ে পড়ে ছিল।"

www.pathagar.com

বাংলাদেশ আজ দেউলিয়ার পথে

জন সোয়ালন, সানডে টাইমস

১৯৭৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর দি সানডে টাইমস পত্রিকায় জন সোয়ালন লিখেছেন বাংলাদেশের দেউলিয়া হওয়ার আরেকটি কাহিনী। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি কৃষি উৎপাদনই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কি করে সেই বাংলাদেশ থাকবে তরতাজা?

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোক দুনিয়ার দরিদ্রতম মানুষের শ্রেণীভুক্ত। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের বার্ষিক গড়পড়তা মাথাপিছু আয় তিরিশ পাউন্ডের কাছাকাছি, যা দিয়ে ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে – যেখানে অধিকাংশ ইউরোপিয়ান অবস্থান করেন– একটি রুম দু'রাতের জন্য ভাড়া নেয়া যায়। বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে যে বৈদেশিক সাহায্য এসেছে। তা ইতিপূর্বে দুই হাজার মিলিয়ন ডলারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। অন্য কথায় প্রতিটি পুরুষ, নারী ও শিশুর জন্য মাথাপিছু দশ পাউন্ড করে সাহায্য এসেছে এছাড়া বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠানও মোটা রকমের সাহায্য দিয়েছে। এই উদার দান যুদ্ধোত্তর দুর্ভিক্ষ এড়াতেও ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট মেরামত দেশকে সাহায্য করেছে। কিন্তু ক্রমেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এই সাহায্যের উপযুক্ত ব্যবহার হয়নি।

ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থা স্পষ্টতঃই দিনে দিনে আরো ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। রিলিফের মাল কালোবাজারে বিক্রি এতো ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে, রেডক্রস-এর আন্তর্জাতিক সংবাদ এক পর্যায়ে বাংলাদেশ থেকে একেবারেই চলে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সারা দুনিয়া সাহায্য দিয়ে বাংলাদেশকে প্লাবিত করে দিয়েছে। এর পরিমাণ 'মার্শাল পরিকল্পনা' –এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অথচ ঢাকা থেকে মাত্র ৩৫ মাইল দূরে গত সপ্তাহে একটি শিশু মেয়ে গাছের পাতা খাচ্ছিল বেঁচে থাকার জন্য। ওর কাহিনী আদৌ নজিরবিহীন নয়।

বাংলাদেশ আজ দেউলিয়া, এর ফলে কলকারখানা স্তব্ধ। শতকরা ৪ ভাগ যানবাহন– যা চাল পরিবহনে অপরিহার্য– ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। দেশটির প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পাটের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। পাটকল ও পরিবহন ব্যবস্থা পুরোদমে চালু রাখার জন্য অতিরিক্ত কল–কব্জা আমদানী করার সামর্থ্য এ সরকারের নেই। ২ কোটি ৬০ লাখ শ্রমিকের এক তৃতীয়াংশ বেকার। চালের দাম বহুগুন বেড়ে গেছে, অথচ মানুষের আয় বাড়েনি। এই দুঃখ– দৈন্যের একটা ফলশ্রুতি বেপরোয়া খুন– খারাবি। দশ দিন আগে বোমা বিস্ফোরণের ফলে বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এদিনই চারটি চালের গুদাম লুণ্ঠিত হয়েছে এবং কয়েকজন আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন সদস্য খুন হয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ট্রাজেডী

জনাথন ডিম্বলবী, নিউ স্টেটসম্যান

মিথ্যা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসা আকাশচুম্বী শেখ মুজিবকে দেখে রাজপথের মানুষ আর হাত তোলে না। মুজিবও হয়তো সহ্য করতে পারেন না এই বাংলাদেশকে। তার ক্ষমতার মসনদ ঘিরে 'অশনি সংকেত'। সত্যকে ছেড়ে তাই মিথ্যার মোহজালে বার বার জড়িয়ে পড়েন মুজিব। '৭৪-এর ২৭ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে লিখেছেন লন্ডন থেকে প্রকাশিত নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকার জনাথন ডিম্বলবী।

এমন একদিন ছিল যখন শেখ মুজিব ঢাকার রাস্তায় বের হলে জনসাধারণ হাত তুলে 'জয় বাংলা'- বাংলাদেশের জয়ধ্বনিতে মেতে উঠত। আর আজ যখন স্বীয় বাসভবন থেকে তিনি অফিসের দিকে যান, তখন দুদিকে থাকে পুলিশের কড়া পাহারা। পথচারীরা সজ্ঞানে তার যাতায়াত উপেক্ষা করে। জাতির পিতাও আর গাড়ির জানালা দিয়ে হাত আন্দোলিত করেন না– তার দৃষ্টি থাকে সামনের দিকে নিবদ্ধ।

বাংলাদেশ আজ বিপজ্জনকভাবে অরাজকতার মুখোমুখি। লাখ লাখ লোক ক্ষুধার্ত। হাজার হাজার মানুষ অনাহারে আছে। অনেকে না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। মফস্বল এলাকায় স্থানীয় কর্মচারীরা ভয় পাচ্ছে যে, আগামী তিনটা মাস খুব দুঃসময় যাবে।

ক্ষুধার্ত মানুষের ভিড়ে ঢাকায় দম বন্ধ হয়ে আসে। এখন আবার চলছে বন্যা উপদ্রুতদের ভিড়। গত তেত্রিশ মাসে ঢাকার জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিরিশ লাখে। নতুন যারা ভিড় করছে তারা এমন নোংরা বাড়িতে থাকে– যার তুলনা দুনিয়ার কোথাও নেই। কোথাও যদি বিনামূল্যে চাল বিতরণ করা হয়, সেখানে শরণার্থীদের মধ্যে মারামারি লেগে যায়। বুদ্ধিজীবীরা বলেন, এই ক্ষুধার্ত জনতা ক্ষেপে গেলে তাদের রক্ষা নেই।

বাংলাদেশ আজ দেউলিয়া। গত আঠার মাসে চালের দাম চারগুণ বেড়েছে। সরকারি কর্মচারীদের মাইনের সবটুকুই চলে যায় খাদ্যসামগ্রী কিনতে। আর গরীবরা থাকে অনাহারে। কিন্তু যতই বিপদ ঘনিয়ে আসছে, শেখ মুজিব ততোই মনগড়া জগতে আশ্রয় নিচ্ছেন। ভাবছেন, দেশের লোক এখনও তাকে ভালোবাসে– সমস্ত মসিবতের জন্য পাকিস্তানই দায়ী– আর বাইরের দুনিয়া তার সাহায্যে এখনো এগিয়ে আসবে এবং বাংলাদেশ উদ্ধার পাবে। নিছক দিবাস্বপ্ন!

মুজিব সম্পর্কে বরাবরই সন্দেহ ছিল। নেতা হিসেবে থাকার আজো তার আকর্ষণ রয়েছে। তিনি আবেগপ্রবণ বক্তা। তার অহংকার আছে– সাহস আছে। কিন্তু আজ দেশ যখন বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখনও তিনি দিনের অর্ধেক ভাগ আওয়ামী লীগের চাঁইদের সাথে ঘরোয়া আলাপে কাটাচ্ছেন। যিনি বাংলাদেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

এবং বহু ছোটখাট বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তিনি আজ আত্মম্ভরিতার মধ্যে কয়েদী হয়ে চাটুকার ও পরগাছা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন।

বাইরের দুনিয়া বাংলাদেশের দুর্নীতির কথা ফলাও করে বলে থাকে। সমাজের নীচতলায় যারা আছে, তারা হয়তো আজ খেতে পেয়েছে– কিন্তু কাল কি খাবে জানে না। এমন দেশে দুর্নীতি অপরিহার্য।

তবে এমন লোকও আছে যাদের দুর্নীতিবাজ হবার কোনো অজুহাত নেই। সদ্য ফুলে-ফেঁপে ওঠা তরুণ বাঙ্গালীরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের শরাবখানায় ভিড় জমায়। তারা বেশ ভালই আছে। এরাই ছিল মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশের বীরবাহিনী। গেরিলাযুদ্ধে এরা পাকিস্তানকে হারিয়েছে। তাদের প্রাধান্য আজ অপরিমেয়। রাজনৈতিক দালালী করে ও ব্যবসায়ীদের পারমিট জোগাড় করে তারা আজ ধনাঢ্য জীবন-যাপন করছে। সরকারি কর্মচারীদের ভয় দেখাচ্ছে। নেতাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে এবং প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগ করছে। এরাই হচ্ছে আওয়ামী লীগের বাছাই করা পোষ্য।

আওয়ামী লীগের ওপরতলায় যারা আছেন, তারা আরো জঘন্য। যাদের মুক্ত করেছেন সেই জনসাধারণের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে তারা সহসা বিলিয়ে দিলেও সাধারণ মানুষের অবস্থা তাতে ভাল হবে না। প্রতিটি মানুষ কেবল নিজের কথাই ভাবছে, ভাবছে আগামীকাল তার কি হবে?

শুনতে রূঢ় হলেও কিসিঞ্জার ঠিক কথাই বলেছেন, 'বাংলাদেশ একটা আন্তর্জাতিক ভিক্ষার ঝুলি'। ত্রাসজনক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার বর্তমান বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার চেষ্টা করছেন। আন্তর্জাতিক সমাজ তার পুতুল বাংলাদেশ সম্পর্কে ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছে। গত ৩২ মাসের রিলিফ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে– এই কঠোর সত্যের মুখোমুখি হয়ে রিলিফকর্মী এবং কূটনৈতিক মিশন ও জাতিসংঘের অফিসাররা বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশের লোকদেরকেই দোষারোপ করছেন।

www.pathagar.com

অন্তিম দশায় একটি দিন

জেকুইস লেসলী; লন্ডন গার্ডিয়ান

লন্ডন গার্ডিয়ান পত্রিকার জেকুইস লেসলী মুজিবী দুঃশাসনের বহু দিনের একটি 'অন্তিম দশা'র দিন দেখেছেন। ১৯৭৪ সালের ২ অক্টোবর ওই একটি দিনের পেছনের আরো দিন, অনাগত আরো ভয়াল দিনের কথা বলেছেন লেসলী।

একজন মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর অসহায় দৃষ্টিতে তার মরণ যন্ত্রণাকাতর চর্মসার শিশুটির দিকে তাকিয়ে আছে। বিশ্বাস হতে চায় না, তাই কথাটি বোঝাবার জন্য জোর দিয়ে মাথা নেড়ে একজন ইউরোপিয়ান বললেন, সকালে তিনি অফিসে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক ভিখারী এসে হাজির, কোলে তার মৃত শিশু।

আজ যারা সবচেয়ে বেশি অনাহারক্লিষ্ট, বিধবা, বৃদ্ধ ও শিশু তাদের ভূমিকা বাংলাদেশের সমাজে একান্তই প্রান্তিক। হাড্ডিসার দেহ ও গর্তে ঢোকা পেট– শিশুদের মধ্যে এটাই আজ সাধারণ দৃশ্য।

বস্তুতঃ বাংলাদেশের আমলারা বন্যাকে বর্তমান দুর্ভিক্ষের কারণ বলে উল্লেখ করলেও বহু বিদেশী পর্যবেক্ষক মনে করেন যে, বাংলাদেশ সরকারই এর জন্য দায়ী। কেউ কেউ অভিযোগ করেন যে, সরকারের রেশনপ্রথা মূলতঃ রাজনৈতিক অসন্তোষ প্রতিরোধের জন্যই করা হয়েছে। অনাহার নিবারণের জন্য নয়। আরো অভিযোগ করা হয় যে, সরকার বিলি-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম; উপরন্তু খাদ্যসামগ্রী বিদেশে পাচারে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

'দুর্ভিক্ষ' বন্যার ফল ততোটা নয়, যতোটা মজুদদারী ও চোরাচালানের ফল। তদুপরি দেশের ভূমিহীন কৃষকেরা রেশন প্রথার বাইরে।' বললেন, স্থানীয় একজন অর্থনীতিবিদ। সম্ভবতঃ লাখ লাখ লোক চাল জোগাড় করতে পারছে না। এ অবস্থায় একমাত্র উপায় খাদ্যশস্য আমদানি করা। কিন্তু আমদানিকৃত খাদ্যসামগ্রী সবই রেশন প্রথা চালু রাখতেই ফুরিয়ে যায়। জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে, "সেদিন পর্যন্ত রেশনের খাদ্যসামগ্রীর শতকরা একভাগ মাত্র জরুরি রিলিফের জন্য ব্যয় করা হয়েছে। সবটাই সিপাই, পুলিশ, সরকারি কর্মচারী এবং বাদবাকী যাদের রেশনকার্ড করার মতো 'ইনফ্লুয়েন্স' আছে, তারাই পেয়েছে।"

সরকারের রেশনিং প্রায়োরিটির পেছনকার যুক্তি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একজন বিদেশী পর্যবেক্ষক বললেন, 'যারা অনাহারে আছে তারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে না, তাদের সে সামর্থ্য থাকে না। যারা অনাহারকে ভয় করে তারাই হাঙ্গামা করতে পারে।' ...'আমরা মূলতঃ একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা লালন করে চলেছি।' বেশ তিক্ততার সাথে বললেন, সাহায্যকারী একটি দেশের অপর একজন পর্যবেক্ষক। 'এর

www.pathagar.com

ফলে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয়, এ কারণেই বাংলাদেশ সরকারের সাহায্যের আবেদন উৎসাহজনক সাড়া জাগাতে পারেনি।'

কিছুসংখ্যক পর্যবেক্ষক এ অভিযোগও করেন যে, সরকারি কর্মচারীরা ভারতে চাল চোরাচালান ব্যবসার লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন। প্রতি বছর যে চাল চোরাচালান হয়ে যায়, তার পরিমাণ ১০ লাখ টন অর্থাৎ বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির প্রায় সমান।

www.pathagar.com

এই কি আজাদী?

ড্যানিয়েল সাদারল্যান্ড, ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর

বোস্টন থেকে প্রকাশিত ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর পত্রিকার ড্যানিয়েল সাদারল্যান্ড প্রশ্ন তুলেছেন– এই কি আজাদী? শেখ মুজিব এখন আর স্বাধীনতার প্রতীক নন। তিনি যা বলেন তা ডাহা মিথ্যা। সত্য আর মিথ্যার এই বিভাজন ফুটে উঠেছে সাদারল্যান্ডের ১৮ অক্টোবর ১৯৭৪-এর লেখায়।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তিন বছর আগে যেমন জনপ্রিয় ছিলেন, আজ আর তেমনটি নন। দুর্নীতি, জীবনযাত্রার মানে দারুণ অবনতি এবং ব্যাপক খাদ্যাভাব অনেকেরই মোহ ভেঙ্গে দিয়েছে। দেশের কোনো কোনো গ্রামে হয়তো আজো শেখ মুজিব সমালোচনার ঊর্ধ্বে। কিন্তু শহরের গরীব মানুষের মধ্যে তার বিরুদ্ধে সমালোচনা বেড়েই চলেছে।

গত দুমাসে যে ক্ষুধার্ত জনতা স্রোতের মতো ঢাকায় প্রবেশ করেছে, তাদের মধ্যে সরকারের সমর্থক একজনও নেই। বন্যা আর খাদ্যাভাবের জন্য গ্রামাঞ্চল ছেড়ে এরা ক্রমেই রাজধানী ঢাকার রাস্তায় ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু মনে হচ্ছে সরকার এদেরকে রাজপথের ত্রিসীমানার মধ্যে ঢুকতে না দিতে বদ্ধপরিকর। এরই মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যককে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে সারাদিনে দু-এক টুকরা রুটি খেতে পাওয়া যায়, মাঝে মাঝে দুএকটা পেঁয়াজ ও একটু-আধটু দুধ মেলে।

ক্যাম্পে একবার ঢুকলে আর বের হওয়া যায় না। 'যে দেশে মানুষকে এমন খাঁচাবদ্ধ করে রাখা হয় সেটা কি ধরনের স্বাধীন দেশ?' ক্রোধের সাথে বলল ক্যাম্পবাসীদেরই একজন। ক্যাম্পের ব্ল্যাকবোর্ডে খড়িমাটি দিয়ে জনৈক সরকারি কর্মচারী আমার (রিপোর্টারদের) সুবিধার্থে প্রত্যেকের খাবার ও খাওয়ার সময়সূচির তালিকা লিখে রেখেছেন।

'তালিকায় বিশ্বাস করবেন না।' ক্যাম্পের অনেকেই বলল। তারা অভিযোগ করল যে, রোজ তারা এক বেলা খেতে পায় এক কি দুই টুকরা রুটি।

কোনো 'এক ক্যাম্পের জনৈক স্বেচ্ছাসেবক রিলিফকর্মী জানালেন যে, 'সরকারি কর্মচারীরা জনসাধারণের কোনো তোয়াক্কা করে না। তারা বাইরের জগতে সরকারের মান বজায় রাখতে ব্যস্ত। এ কারণেই তারা মানুষকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বিদেশীরা ভূখা জনতাকে রাস্তায় দেখুক এটা তারা চায় না।'

'দুঃস্থ মানুষের অসন্তোষ কখনো সুগঠিত বিরোধী আন্দোলনের খাতে ধাবিত হবে কিনা, ভবিষ্যতই তা জানে। যারা এ দেশে দীর্ঘকাল যাবত বসবাস করছেন, তারা বলেন

www.pathagar.com

যে, বাঙ্গালী মুসলমানরা অন্তহীন দুঃখ সইতে সক্ষম।

কিন্তু বাংলাদেশে বিরোধী দল রয়েছে– তা যতো ক্ষুদ্র বা বিচ্ছিন্নই হোক না কেন, তারা বিপ্লব চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এই বিরোধী দলগুলোর দরিদ্র জনগণকে পরিচালিত করার এখনো দেরি আছে। তবে কিছুসংখ্যক 'মুক্তিযোদ্ধা' যারা বাংলাদেশের মুক্তির পূর্বে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছে এবং আজ মনে করছে যে শেখ মুজিব ও তার অনুচরেরা তাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে– তারা বিরোধী দলের আহবানে সাড়া দিয়েছে।

এইসব বিরোধী মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম হচ্ছেন জনৈক লেফটেন্যান্ট কর্নেল যিনি মুক্তিসংগ্রামের একজন বীরযোদ্ধা ও পরবর্তীকালে ঢাকার সামরিক ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিলেন– মাস কয়েক আগে তিনি 'আন্ডারগ্রাউন্ডে' চলে গেছেন।

www.pathagar.com

দুঃখ ও দৈন্যের ফসল তুলছে

লরেন্স লিফসুলজ, ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ

স্বাধীন বাংলাদেশের গ্রামগুলো খাঁ খাঁ করছে। কাজ নেই, খাবার নেই। মানুষ ছুটছে শহরে। শহরেও খাদ্যের চড়া দাম। স্বাধীন বাংলাদেশের দুঃখ ও দৈন্যের ফসল এভাবেই ফুটে উঠে। '৭৪ সালে ২৫ অক্টোবর হংকং থেকে প্রকাশিত ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ'র লরেন্স লিফসুলজ দিয়েছেন এই ফসলের বর্ণনা।

কয়েক সপ্তাহ ধরেই একটা বড় রকমের আকালের প্রাথমিক আলামত দেখা যাচ্ছিল। বিপুলসংখ্যক চাষীর গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে আগমন, খবরের কাগজে রোজ অনাহারে মৃত্যুর খবর এবং হালে ঢাকা কর্তৃপক্ষের জেলায় জেলায় লঙ্গরখানা খোলার সিদ্ধান্ত– এই সবকিছুই প্রমাণ করছে যে, দেশে ভয়ানক আকাল দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে– কেননা, সরকার খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে মনে হয় না। মূলতঃ গত ছয় মাসে চালের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলেই গরীব শ্রেণীর লোক অনাহারের কবলে পড়েছে। যারা আজ অনাহারে জীবন্ত কংকালে পরিণত হয়েছে তারা বস্তুতঃ দেশের খাদ্যশস্য ব্যবসায়ে এতোদিনকার দুর্নীতি ও মুনাফাবাজিরই শিকার। অথচ বেশি দাম দিতে পারলে বাজারে চালের অভাব নেই।

রোজই মন্ত্রীরা খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের কাছে দাম কমাবার জন্য আবেদন জানান। সরকারি ঘোষণা থেকে বোঝা যায় তারা ভাল করেই জানেন কারা খাদ্যসামগ্রী মজুদ করছে ও দাম বাড়িয়ে কারসাজি করছে। তবে এটাও স্পষ্ট যে, সরকার হুঁশিয়ারি দেয়ার চেয়ে বেশি কিছু করতে প্রস্তুত নয় অথবা সক্ষম নয়।

সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে হঠাৎ করে চালের দাম মণপ্রতি ৪০০ টাকায় উঠে গেল। অর্থাৎ তিন বছর আগে স্বাধীনতার পূর্বে যে দাম ছিল এখন দাম তার দশ গুণ। এই মূল্য বৃদ্ধিকে এভাবে তুলনা করা যায় যে, এক মার্কিন পরিবার তিন বছর আগে যে রুটি ৪০ সেন্ট দিয়ে কিনেছে তা আজ কিনছে ৪ পাউন্ড দিয়ে। কালোবাজারি অর্থনীতির কারসাজিতেই এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। তবে তা খুব সাময়িক ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই চালের দাম ৩০০ টাকায় নেমে আসে। অবশ্য তাও অসম্ভব চড়া দাম। সকলেই আশংকা করছে যে, আগামী কয়েক মাসে চালের দামের স্থিতিশীলতার আরো অবনতি ঘটবে।

২৩শে সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন যে, প্রতি ইউনিয়নে একটি করে মোট ৪৩০০ লঙ্গরখানা খোলা হবে। প্রতি ইউনিয়নের জন্য রোজ বরাদ্দ হলো মাত্র দু' মণ ময়দা– যা এক হাজার লোকের প্রতিদিনের

www.pathagar.com

মাথাপিছু একটি রুটির জন্যও যথেষ্ট নয়। অথচ কোনো ইউনিয়নের লোকসংখ্যা এক লাখেরও বেশি। এই রিলিফ সেখানে আঁচড়ও কাটবে না। এমন অভিযোগও রয়েছে যে, সরকারি গুদাম থেকে যে খাদ্যশস্য বের করা হয় তার বেশিরভাগই সাধারণ বেসামরিক লোকের কাছে পৌঁছায় না। বিশেষ ডিফেন্স রেশনিং প্রথায় তা চলে যায় প্যারামিলিটারী সৈন্যবাহিনী ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর কাছে– যারা এমনিতেই অতি নিম্নমূল্যে পুরো রেশন পেয়ে থাকে।

কৃষি বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মতে, সরকারের বর্তমান স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সৈয়দপুর প্রভৃতি রেশনিং এলাকার লোকের রেশন সরবরাহ করে যাওয়া। কেননা, এগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। বড় রকমের বিক্ষোভ এড়াতে হলে এসব শহর এলাকায় কন্ট্রোল দরে খাদ্যশস্য পরিমাণে যতো স্বল্পই হোক– সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের তুলনায় বাংলাদেশের দোকানপাট ও খাদ্যশস্যবাহী নৌকা লুণ্ঠিত হয়েছে খুব কমই। প্রতিবাদও সীমাবদ্ধ রয়েছে অল্পসংখ্যক মিছিলকারীর মধ্যে, আর শুধু গরম বক্তৃতায়। এর কারণ এই যে, বিরোধী যুদ্ধংদেহী নেতৃবৃন্দের অধিকাংশকে সরকার কারারুদ্ধ করে রেখেছে।

www.pathagar.com

লঙ্গরখানার অভিজ্ঞতা

পিটার প্রেসটন, লন্ডন গার্ডিয়ান

লঙ্গরখানার আবার অভিজ্ঞতা কি? মুজিবী দুঃশাসনে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের মৃত্যু পথযাত্রী বণি আদমরাই জানে লঙ্গরখানার আসল কথা। বাইরে থেকে কতটুকুই বা দেখা যায়। বোঝা যায়? যতোটুকু দেখা যায় তাই তো নাড়া দিয়ে যায় আমাদের চেতনাকে। লঙ্গরখানার এমনি এক বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন পিটার প্রেসটন, লন্ডন গার্ডিয়ান পত্রিকার ৩০ অক্টোবর '৭৪ সংখ্যায়।

ডঃ কিসিঞ্জার ঠিকই বলেছিলেন কিন্তু আজ ঢাকায় এসে তিনি কোনোরূপ বিরূপ মনোভাব দেখবেন না। তিনি কখনো বাংলাদেশ চাননি, বরং বাংলাদেশ যাতে না হয় সে চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বাংলাদেশ একটি 'আন্তর্জাতিক ভিক্ষার ঝুলি' হবে। আজ সেই ঝুলির তলা পলকেই দেখতে পাবেন– তার পরই সরে পড়বেন ভিন্ন দেশের রাজধানীতে।

দুই বাংলার সামনেই মৌলিক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে– কেননা, উভয় বাংলাই আজ দুর্ভিক্ষের বীভৎসতার মাঝে গড়াগাড়ি খাচ্ছে। তবে, দিল্লী ওপার বাংলার অভাব কিছুটা মেটাতে পারবে কিন্তু বাংলাদেশের সে সম্পদটুকুও নেই। ফলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই প্রশ্নটি অধিকতর নগ্নরূপে দেখা দিয়েছে। তথাকথিত সভ্য দুনিয়ায়– যে দুনিয়ায় একজনের দুঃখ-দৈন্য কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে কয়েক ঘণ্টা পর অপর একজনের টেলিভিশনের রাত্রির খোরাক যোগায় মাত্র কি আসে যায় যদি আট কোটি মানুষের একটি দেশ তাদের সমস্যার মোকাবিলা করতে না পারে?

বাংলাদেশে তেমন কোনো অজানা বিপর্যয়ের অবকাশ নেই। এই সেদিনের একটি ছবি বাংলাদেশের দৃশ্যপট তুলে ধরেছে: এক যুবতী মা- তার স্তন শুকিয়ে হাঁড়ে লেগে গেছে; ক্ষুধায় চোখ জ্বলছে– অনড় হয়ে পড়ে আছে ঢাকার কোনো একটি শেডের নীচে; কচি মেয়েটি তার দেহের ওপর বসে আছে গভীর নৈরাশ্যে– দু'জনাই মৃত্যুর পথযাত্রী।

ছবিটি নতুন, কিন্তু চিরন্তন। স্বাধীনতার পর থেকে ঢাকা দুনিয়ার সবচেয়ে কলিকাতার চেয়েও বীভৎস শহরে পরিণত হয়েছে। সমস্ত বীভৎসতা সত্ত্বেও কলিকাতায় ভিড় করা মানুষের যেন প্রাণ আছে, ঢাকায় তার কিছুই নেই। ঢাকা নগরী যেন একটি বিরাট শরণার্থী ক্যাম্প।

একটি প্রাদেশিক শহর ঢাকা লাখ লাখ জীর্ণকুটীর, নির্জীব মানুষ আর লঙ্গরখানার কিউতে ছেয়ে আছে।

গ্রামাঞ্চলে যখন খাদ্যাভাব দেখা দেয়, ভুখা মানুষ ঢাকার দিকে ছুটে আসে। ঢাকায়

www.pathagar.com

তাদের জন্য কোনো খাদ্য নেই। তারা খাদ্যের জন্য হাতড়ে বেড়ায়, প্রতিবাদ করে, অবশেষে মিলিয়ে যায়। গেল সপ্তাহে একটি মহলের মতে শুধুমাত্র ঢাকা শহরেই মাসে ৫০০ লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে। এর বেশিও হতে পারে, কমও হতে পারে। নিশ্চিত করে বলার মতো প্রশাসনযন্ত্র নেই (যেমন ছিল না বন্যার সময়ে)।

বাংলাদেশ মধ্যযুগে ফিরে যাবে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বহুগুণ। কিন্তু মধ্যযুগীয় কৃষি ব্যবস্থা অটুট থাকবে।

এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী এই নতুন নয়-দশ বছর আগে পাকিস্তানী প্রভুত্বের প্রতিবাদে বাংলাদেশের লোক নিজেরাই এ ধরনের উক্তি করেছিল জন্মের পরপরই বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সাহায্যের এক অভূতপূর্ব ফসল কুড়িয়েছিল: ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ড। আজ সবই ফুরিয়ে গেছে। কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

রাজনীতিবিদ, পর্যবেক্ষক, দাতব্য প্রতিষ্ঠান... সবাই এক নতুন যুক্তি পেশ করছেন... যা অপরাধকে নিরাপদ করছে, দায়িত্বকে করেছে অকেজো। তাদের মোদ্দা যুক্তি হলো এই যে, বাংলাদেশের ঝুলিতে মারাত্মক ফুটো আছে, যতো সাহায্য দেয়া হোক না কেন, দুর্নীতি, আলসেমী ও সরকারি আমলাদের আত্মঅহমিকার ফলে অপচয় ফুরিয়ে যাবে। বেশি দেয়া মানেই বেশি লোকসান।

www.pathagar.com

নেতৃত্বে ব্যর্থতা : অনাহার

স্ট্যান কার্টার, ডেইলী নিউজ

মহা মন্বন্তর বাংলাদেশের। এগিয়ে এসেছে বিশ্ববাসী খাদ্য ও আর্থিক সাহায্য নিয়ে। কিন্তু মুজিবের 'চাটার দল' তা শেষ করে দিচ্ছে। পাচার করছে ভারতে। শেখ মুজিবের জ্ঞাতসারেই ঘটে এসব। অথচ মুজিব এক নেতা! তার নেতৃত্ব কত ব্যর্থ তা দেখিয়েছেন নিইউয়র্ক থেকে প্রকাশিত ডেইলী নিউজ পত্রিকার স্ট্যান কার্টার পত্রিকাটির ১ নবেম্বর '৭৪ সংখ্যায়।

তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে যখন বাংলাদেশের সৃষ্টি করা হয় তখন বিদেশী কূটনীতিবিদরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বাংলাদেশ একটা আন্তর্জাতিক 'বাসকেট কেস'-এ পরিণত হবে। বাংলাদেশে যা ঘটছে, তাতে তাদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশের অবস্থা অন্যরূপ হতে পারত– অর্থাৎ কূটনীতিবিদদের ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হতো– যদি বাংলাদেশ ভাল নেতৃত্ব পেতো। যদিও সাত কোটি পঞ্চাশ লাখ লোক ফ্লোরিডার মতো আয়তনের একটি দেশে ভিড় করে আছে, এর মাটি সত্যিই উর্বর। এদেশে বছরে ১ কোটি ২০ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হয়। অবশ্য এ চাউল সমস্ত জনসংখ্যার খোরাকের জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু এদেশ আরো বেশি চাল উৎপন্ন করতে পারতো, যদি সরকার কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত করতেন।

তা' না করে সরকার 'সমাজতন্ত্রের' নীতি গ্রহণ করেছেন, যদিও এ নীতি কার্যকরী করার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা সোভিয়েত রীতি অনুসরণ করে শিল্প, কলকারখানা গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন লাভ অবশ্য কিছুই হয়নি। যে ইস্পাত মিলের স্বপ্ন তারা দেখছেন, তা এখনো কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। এদিকে বিদেশী মুদ্রা অর্জনকারী পাটের বেশিরভাগ ১০ লাখ টন চাল ভারতে পাচার হয়ে গেছে।

দেশের সম্পদ যে বিদেশে চলে যাচ্ছে তা সম্ভব হচ্ছে সরকারের অভ্যন্তরে ব্যাপক দুর্নীতির জন্য। বাংলাদেশের 'জর্জ ওয়াশিংটন' ও প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান নিজে হয়তো কোনো দিনই ঘুষ গ্রহণ করেননি; কিন্তু সর্বত্র গুজব ছড়িয়ে রয়েছে যে তার স্ত্রী ঘুষ খান। সরকারি কর্মকর্তারা যে ঘুষ খান তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তারা যদি ঘুষ না খেতেন, তাহলে হয়তো চোরাচালান সম্ভব হতো না।

বিদেশী বিশেষজ্ঞরা বলেন, বাংলাদেশে অনাহারে ও অনাহারজনিত রোগে দশ লাখ লোক মারা যাবে। সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন শহরের লোকদের খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখতে– কেননা শহরের লোকদেরই গোলযোগ সৃষ্টি করার সম্ভাবনা বেশি। তাদের জন্য বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য কিনতে গিয়ে সরকার বস্তুতঃ দেউলিয়া হতে চলেছেন।

www.pathagar.com

অনাহারের জন্য যারা দায়ী

এইচডিএস গ্রীনওয়ে, ওয়াশিংটন পোস্ট

শেখ মুজিব যতোই অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করুন না কেনো, তিনি এবং তার স্যাঙ্গাতরাই যে দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী তা উপলব্ধি করেছেন ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার এইচডিএস গ্রীনওয়ে। এ বিষয়ে তার বর্ণনা প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালের ৮ নবেম্বরে।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে আকাল চলছে। রোজ ট্রেনে করে অনাহারক্লিষ্ট মৃত্যুপথযাত্রী জনাকীর্ণ রাজধানীতে এসে ভিড় করছে। এদের মধ্যে অনেকেই ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশনের বাইরে যায় না। সেখানকার পেভমেন্ট-এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারিবারিক গন্ডিতে বিভক্ত হয়ে বসবাস করছে তারা। তাদের গর্তে ঢোকা চোখে চরম ক্ষুধাতুর দৃষ্টি, মাছিতে তাদের দেহ ছেয়ে আছে, তারা মাছি তাড়ায় না। শিশুগুলো এতোই শীর্ণ যে, তাদের বুকের পাঁজর চামড়ার নীচে পাখির খাঁচার মতো দেখায়। কয়েকটি শিশুর পেট পিঠে লেগে গেছে, হাড় শুকিয়ে গেছে, চোখ বের হয়ে আছে– এদেরকে মানুষ বলেই মনে হয় না। একটি নগ্নদেহ লোক এক কোনায় পড়ে আছে।

কংকাল ছাড়া আর কিছু নয়– সারা শরীর ঘায়ে ভরা। লোকজন তার পাশ দিয়ে যাবার সময় দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। এমনি অবস্থায় আরো লোক স্টেশনের দেয়ালের পাশে পড়ে আছে। কেউ কেউ হয়তো জীবিত নেই; কিন্তু আমরা নিশ্চিত জানি না কে মরে গেছে। অপেক্ষাকৃত সুস্থ ছেলেরা শুকনো গোবর কুড়াচ্ছে, জ্বালানি হিসেবে পোড়াবার জন্য অন্যের আবর্জনার স্তূপ হাতড়ে চলেছে, কিছু খাবার পায় কিনা।

কেউ জানে না এই আকালে কত জীবন শেষ হয়ে গেছে। দেশে কোনো নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা এতোই খারাপ যে, দেশের দূর-দূরান্তে শত শত লোক মরে গেল, অথচ সরকারের কেউ শুনতেও পায়নি। যে কথা সকলে জানে তা হচ্ছে এই যে, গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে যেখানে ব্রহ্মপুত্র নদ ভারত থেকে বের হয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে সেখানে বন্যা দেখা দেয়। বন্যার ফলে গ্রীষ্মকালীন ফসলাদি ডুবে যায় এবং যেসব জেলায় বন্যার প্রকোপ বেশি হয়েছে, সেখানে শীতকালীন শস্য– যা সাধারণতঃ নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে কাটা হয় আদৌ রোপণ করা যায়নি।

সারাদেশে ফসল নষ্ট হয়নি। ঘাটতিটুকু অনায়াসেই কাটিয়ে ওঠা যেতো। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় খাদ্য বিতরণে সরকারি অক্ষমতা, ব্যাপক দুর্নীতি, ভারতে চাল পাচার প্রভৃতির জন্য তা একটি জাতীয় পর্যায়ে পরিণত হয়েছে।

ট্রাজেডী হচ্ছে এই যে, বর্তমান আকালও এতো ভয়াবহ এবং দীর্ঘস্থায়ী হতো না, যদি সরকার বন্যা উপদ্রুত এলাকায় সময়মত খাদ্য বিতরণ করত।

www.pathagar.com

ঢাকা আকাল অনুভব করতে পারছে

মার্টিন ডেভিডসন, ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ

মুজিবী দুঃশাসনের রক্তচক্ষু যতোই ভয়াল হোক না কেন, তার চেয়েও ভয়াল ছিল দুর্ভিক্ষ। কাঁপিয়ে দিয়েছিল বিশ্ব মানবাত্মা! আর তাই রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সেদিন কয়েকজন আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবী বিবৃতি দিয়ে স্পষ্টতই বলেছিলেন– দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী শেখ মুজিবের রাজনীতি। হংকং থেকে প্রকাশিত '৭৪-এর ৮ নভেম্বর সংখ্যা ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ পত্রিকায় মার্টিন ডেভিডসনের সেই বর্ণনা:

বাংলাদেশের একদল সেরা জ্ঞানী ব্যক্তি, আইনজীবী ও সম্পাদক ঢাকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেন যে, 'বর্তমান দুর্ভিক্ষ যার অস্তিত্ব অবশেষে সরকার স্বীকার করেছেন– কেন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফল নয়, বরং রাজনীতিরই ফল। দলটি নিজেদেরকে 'সিভিল লিবার্টিজ এ্যান্ড লীগাল এইড কমিটি' বলে অভিহিত করেন। তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে 'সরকারের সর্বস্তরের রাজনীতিবিদরা তাদের দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও দেশের সম্পদের অপব্যবহারের মাধ্যমে এই দুর্ভিক্ষ ডেকে এনেছেন।' বিবৃতিতে আরো অভিযোগ করা হয় যে, 'এবারকার মসিবতের জন্য সরকারের মদদপুষ্ট মজুদদার, চোরাকারবারী ও কালোবাজারীরা দায়ী। কাজেই, সরকার যেমন দাবি করছেন যে, '১৯৭৪ সালের আকাল বন্যা অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফল', তা নয়। এটা মনুষ্যসৃষ্ট এবং মানুষের অসাধুতারই প্রতিফল।

ঠিক কত লোক না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, তা নিয়ে ঢাকার শরাবখানা ও ককটেল পার্টিতে বিতর্ক চলে। কিন্তু যারা কিছু সংখ্যক লঙ্গরখানা নিজ চোখে দেখেছেন, তাদের কোনো সন্দেহ নেই যে, মৃতের সংখ্যা অকল্পনীয়। যে সব ফটোগ্রাফার রেডক্রসের হেলিকপ্টার চড়ে দেশের উত্তরাঞ্চলে রংপুর-এর ন্যায় আকালগ্রস্ত এলাকা দেখতে যান এবং তাদের ক্যামেরা ভর্তি করে প্রামাণ্য ছবি নিয়ে আসেন– কখনো কখনো তাদের প্রামাণ্য চিত্রগুলো এতোই মর্মান্তিক যে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, একমাত্র ঢাকা শহরেই রোজ ৭০ থেকে ১০০ জন লোক অনাহারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। রংপুরে এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দেড় লাখ; কিন্তু এ মাসে নতুন ফসল না ওঠা পর্যন্ত এ সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়তে থাকবে।

বিদেশী দূতাবাস এবং জাতিসংঘের রিলিফ টিমের বিশেষজ্ঞরা একমত যে, বর্ষাকালীন বন্যায় প্রায় ১১ মিলিয়ন (১১ লাখ) টন চাল লোকসান হয়েছে। কূটনীতিবিদরা বলেন যে, এই লোকসান বর্তমানের ব্যাপক অনাহারের যথেষ্ট কারণ হতে পারে না: কেননা বাংলাদেশ বরাবরই বন্যা অথবা অনাবৃষ্টিতে ভুগেছে। কিন্তু এর আগে এই ধরনের দুর্ভিক্ষ হতে দেখা যায়নি।

www.pathagar.com

জাতিসংঘের জনৈক অফিসার বললেন, 'দুর্ভিক্ষের জন্য পাচার আর দুর্নীতিই দায়ী। অপর একজন তাতে সায় দিলেন, কিন্তু জোর দিলেন দুর্নীতির ওপর।

এদিকে সরকার কিন্তু পুরো সমস্যার জন্য দোষ দিয়ে চলেছেন অসময়ে বন্যার। জনৈক সরকারি মুখপাত্র একটি পরিসংখ্যান বের করেছেন, যাতে আসাম-সীমান্তের পাহাড়ী এলাকায় বন্যার বিশদ বিবরণ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সরকারি বক্তব্য হলো এই যে, ব্রহ্মপুত্র নদের ঊর্ধ্বতন অঞ্চলে বন্যা সম্পূর্ণ এক নতুন ঘটনা। অপরপক্ষে জনৈক ভারতীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ বলেন, 'এ ধরনের উক্তি নিছক উদ্ভট-ব্রহ্মপুত্র এ অঞ্চলকে বরাবর প্লাবিত করে থাকে।'

আসল কথা, যতোদিন পূর্ববাংলা ইসলামাবাদের শিল্পোন্নত বন্ধুদের সাথে একত্রে ছিল, ততোদিন খাদ্য-শস্য সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থা আজকের চেয়ে উন্নত ছিল।

সরকারি হিসাব মতে, ৭০০ মিলিয়ন ডলারের বিভিন্ন রকম সাহায্য ছাড়াও, গত এক বছরে বাংলাদেশ ৫০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের খাদ্য-শস্য সাহায্য হিসেবে পেয়েছে। চল্লিশটিরও বেশি দেশ এবং OXFAM ও GARITAS-সহ বহু রিলিফ প্রতিষ্ঠান এ সাহায্য যুগিয়েছে। অথচ তা রংপুরের কোনো সাহায্যে আসেনি।

কিছুদিন আগে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি ফররুখ আহমদ ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর মৃত্যুর কারণ অনাহার। কর্তৃপক্ষের অনেকেই তাঁর মৃত্যুতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অনাহারের মতো মর্মান্তিক সমস্যার যথার্থ ও অকৃত্রিম সাড়া পাওয়ার জন্য আরো অপেক্ষা করতে হবে।

www.pathagar.com

দুর্ভিক্ষে অসংখ্য লোক মরছে

কস্তুরি রংগন, নিউইয়র্ক টাইমস

হা হা করে সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ আসছে। কিন্তু শেখ মুজিবের বঙ্গালয়ের নীল মোহ তখনো কাটেনি। বিদেশ থেকে প্রাপ্ত রিলিফে আকণ্ঠ ডুবে থাকে মুজিব ভক্তরা। গুটিকতক অফিসার বুঝেছিলেন কি হতে যাচ্ছে। তাদের কথাই ১৯৭৪ সালের ১৩ নভেম্বর নিউইয়র্ক টাইমসে লিখেছেন কস্তুরি রংগন।

কয়েক সপ্তাহ আগে বাংলাদেশ যে দুর্ভিক্ষের ভয় করছিল, তা এখন বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানকার অফিসাররা স্বীকার করেছেন যে, বিদেশ থেকে মোটা রকম সাহায্য আসার পরও এতো ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জন্য তারা প্রস্তুত ছিলেন না।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের জনৈক কর্মকর্তা বললেন, 'কয়েক হাজার লোক এরই মধ্যে মারা গেছে এবং আগামী কয়েক সপ্তাহে পুষ্টির অভাবে আরো হাজার হাজার লোক মারা যেতে পারে।'... 'ব্যাপক রকম ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে, ভবিষ্যতেও আশা নেই'– অফিসারটি জানালেন। তিনি বর্তমান অবস্থাকে ১৯৪৩ সালের মহামন্বন্তরের সাথে তুলনা করলেন। সেই দুর্ভিক্ষে এদেশে লাখ লাখ লোক প্রাণ হারিয়েছিল।

সরকারি পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে, কেননা আকালগ্রস্তদের সংখ্যা সরকার অনুমিত সখ্যার তিন গুণ বেশি দাঁড়িয়েছে। আগস্ট মাসে যখন সরকার লঙ্গরখানা খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে তখন ধরে নেয়া হয়েছিল যে, দেশে আনুমানিক ২০ লাখ লোককে খাওয়াবার জন্য ৪ হাজার লঙ্গরখানাই যথেষ্ট হবে।

সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ ৩ হাজারেরও কম লঙ্গরখানা চালু করা হয়েছিল। এর অধিকাংশই চাহিদামতো খাদ্য সরবরাহ পাচ্ছিল না। সরকারের মজুদ খাদ্যশস্য ছিল না, বিদেশ থেকে আমদানিও কমে গিয়েছিল। ফলে সারা সেপ্টেম্বরই খুব দুঃসময় গেছে। এ সময়ে মাত্র ২০ হাজার টন খাদ্যশস্য বাংলাদেশের বন্দরে এসে পৌঁছেছে। সে তুলনায় এ মাসে ও আগামী মাসে মোট ২৫০ হাজার টন পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে।

লঙ্গরখানায় যে রেশন দেয়া হচ্ছে তা যতোটুকু না হলে নয়, তার চেয়েও কম। প্রতিটি কেন্দ্রে একবার করে যে এক হাজার কিংবা তারো বেশি লোক এসে ভিড় করে, তারা মাথাপিছু একটি করে রুটি অথবা চাল-ডাল মিশ্রিত ৪ আউন্স খিঁচুড়ি পেয়ে থাকে। কোনো কোনো লঙ্গরখানায় রেশন বলতে শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া 'টিকে থাকার বিস্কুট' দেয়া হচ্ছে।

সরকারি কর্মচারীরা এতোদিনে অনাহারে এতো লোক যে মারা গেল তা মেনে নিয়েছেন। এখন তাদের দুর্ভাবনা ভবিষ্যতের খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে বন্যা ও আকাল

www.pathagar.com

বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক সাহায্য লাভে সহায়তা করেছে। যদিও ২০টিরও বেশি দেশ খাদ্যশস্য পাঠাতে চেয়েছে, তবুও এ বছর সরকারের খাদ্য ঘাটতি হবে ১০ লাখ টন।

বিদেশ থেকে খাদ্য সরবরাহ আসতে থাকায় বর্তমান পরিস্থিতির 'নিশ্চয়ই উন্নতি হয়েছে কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আবার অবস্থার অবনতি হতে পারে'– বললেন খাদ্য সচিব আবদুল মোমেন খান।

www.pathagar.com

হতাশার দেশ

পিটার আর কান, ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল

স্বাধীনতা পাওয়ার আগে যে আকাশচুম্বী আশায় জনগণ বুক বেঁধেছিল তা কিছুদিনের মধ্যেই উবে যায়। মুজিবী দুঃশাসন জাতিকে কিভাবে হতাশ করেছিল তা দেখেছেন নিউ ইয়র্কের ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের পিটার আর কান। ১৯৭৪ সালের ২১ নভেম্বর প্রকাশিত হয় এই অতলান্ত হতাশার চকচকে চিত্র।

চেষ্টা করলে প্রায় সব দেশ সম্পর্কেই অস্পষ্টভাবে সান্ত্বনাদায়ক কিছু বলার কথা চিন্তা করা যায়; কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কে তা সম্ভব নয়। এ দেশের ব্যাপক মানবিক বিপর্যয়, দুঃখ-কষ্ট, বহুমুখী আর্থিক দৈন্য, সম্পদ ও জমির অভাব, জনসংখ্যার বিরামহীন বৃদ্ধি, সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া রাজনীতি এবং নৈরাশ্যব্যঞ্জক মানসিকতা সবকিছু মিলে বাংলাদেশকে দুনিয়ার সবচাইতে হতাশ জাতিতে পরিণত করেছে।

বাংলাদেশের প্রধান সমস্যাগুলোর একটি হচ্ছে, এদেশ কোনো বৃহৎ শক্তির কাছে মূল্যবান নয়। ভৌগোলিক অবস্থার জন্য দু'দিক থেকে ভারতীয় ভূখণ্ড স্যান্ডউইচের মতো চেয়ে আছে। বাংলাদেশ ভারত ছাড়া অপর কোনো শক্তির কাছে সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ দেশের এমন কোনো খনিজ সম্পদ নেই, যা অন্যকোনো দেশের প্রয়োজন। কোনো দেশ এখানে ঘাঁটি নির্মানের জন্যও আগ্রহী নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী বৃহৎ শক্তি। কিন্তু মনে হয় না রাশিয়ানরাও এ দেশ থেকে বেশি কিছু পেতে চায়।

সবকিছু বিবেচনা করলে মনে হয়, দুনিয়া বাংলাদেশকে বেশ উদারভাবেই সাহায্য করেছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এ দেশকে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয়া হয়েছে।

একজন পর্যবেক্ষক– যেমন এই রিপোর্টার– যিনি ১৯৭১ সালের বেশিরভাগ সময় বাংলাদেশে কাটিয়েছেন, বাঙ্গালীদের মুক্তি সংগ্রামে সহানুভূতি জানিয়েছেন এবং ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের যুদ্ধের পর প্রতিটি বাড়ির ছাদে নতুন পতাকা উড়ছে আর রাস্তায় রাস্তায় জনতাকে 'জয় বাংলা' স্লোগানে হর্ষোৎফুল্ল দেখে দেশে ফিরে গেছেন– তার পক্ষে তিন বছর পর বাংলাদেশ পুনর্দর্শন হতাশাব্যঞ্জক। উচ্চাশা আগেই শেষ হয়ে গেছে, জাতীয় উদ্দীপনাও ভেঙ্গে পড়েছে। আর জাতি হিসেবে যদি দীর্ঘকাল টিকেও থাকে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও নৈরাশ্যময়।

বাঙ্গালী বন্ধুরা এবং অপরিচিতি লোকেরা যখন বলেন, 'পাকিস্তান আমলের সেই দিনগুলোতে সবকিছু কতোই না ভাল ছিল,' এখন বোঝা যায় অবস্থার কতো শোচনীয় অবনতি ঘটেছে।

www.pathagar.com

অবস্থা কতো খারাপ হয়েছে, তা আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে ঢাকার রাস্তায় সর্বহারা ও ভূখা মানুষদের দেখতে হয়। এরা পেশাদার অন্ধ বা খোঁড়া ভিখারী নয়। এদের মধ্যে বৃদ্ধ মানুষগুলো রাস্তার পাশে পড়ে আছে– এতোই শুকিয়ে গেছে যে, গাড়ীর সামনে থেকে সরে যাওয়ার সামর্থ্যটুকুও এদের অবশিষ্ট নেই। এদের মধ্যে রয়েছে মহিলা। দেহের আধাটুকু মাত্র ছেঁড়া কাপড়ে কোনোমতে ঢাকা। এরা জরাজীর্ণ, উলঙ্গ, পেটমোটা, শিশু-সন্তানদেরকে কতকটা কোলে করে, কতকটা টেনে-হেঁচড়ে লক্ষ্যহীনভাবে রাস্তার এপাশ-ওপাশ করছে। অনাহারে মরছে এরাই। এদের আরো বেশি, অনেক বেশি সংখ্যায় দেখতে হলে যেতে হয় গ্রাম-বাংলায় যেখানে শতকরা ৯০ জন বাঙ্গালীর বসবাস।

পরিস্থিতি যে কতো শোচনীয় তা বোঝার আরো একটি পথ আছে। তাহলো ধর্মযাজক অথবা ত্রাণকর্মী– যাদের বাংলাদেশের প্রতি নিষ্ঠা রয়েছে– তাদের সঙ্গে আলাপ করা। তারা বাংলাদেশে সাহায্য বন্ধ করে দেবার সম্ভাবনার কথা বেশ জোর দিয়ে বললেন। আরো বললেন যে, অনাহারে লাখ লাখ লোকের মৃত্যু অবধারিত। তাদের মতে দেশটা ভেঙ্গে পড়বে– ১৯৮০ সালে না ভেঙ্গে ১৯৭৫ সালে ভেঙ্গে পড়লেই বরং ভাল। এসব কথা তারা বলেন এই আশায় যে, ধ্বংসস্তূপের মাঝ থেকে হয়তো এক নতুন ব্যবস্থা জন্মলাভ করবে। জনৈক অর্থনীতিবিশারদ বললেন, 'কেন নয়? আমরা যা করছি তা শুধু অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে ক্ষণিকের জন্য ঠেকিয়ে রাখার জন্য।' একজন ধর্মযাজক যিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় এদেশে কাটিয়েছেন– বললেন, 'বাংলাদেশে অকল্পনীয় ভাবনাও ভাবতে হয়।'

শেখ মুজিব যখন পাকিস্তানী কারাগার থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন তখন দেশবাসীর কাছে তিনি ছিলেন একজন অতিমানব। এতোদিনে তাকে দোষে-দুর্বলতায় মিলে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তার তীব্র সমালোচনা করা হচ্ছে। কারণ, তিনি সবসময় দালাল ও চাটুকারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন। তার চারপাশের কঠোর বাস্তবতার চেয়ে বরং নিজের বাগাড়ম্বরে বিশ্বাস করেন এবং কঠিন সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করেন।

শেখ মুজিব সম্পর্কে এখন গরীব চাষীরা কি বলছে? জিজ্ঞাসা করলাম গ্রামের এক মাতব্বরকে। তিনি জবাব দিলেন, 'তারা বলেন কোথাও কোনো সমস্যা নেই। কেননা, তারা ঠিকই তিন বেলা খেতে পাচ্ছে না।'

www.pathagar.com

তিন বছর পরও বিপদগ্রস্ত এলাকা

বার্নাড ওয়েনরাব, নিউইয়র্ক টাইমস

স্বপ্ন দেখেছিলেন শেখ মুজিব। সেই স্বপ্নে বিমোহিত করতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশের সরলপ্রাণ মানুষদের। মিথ্যার বেসাতী করে তিন বছরেও বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে যৌক্তিক পর্যায়ে পৌঁছানো যায়নি। বিপদ বিপদই থেকে গেলো। স্বাধীনতা নিরর্থক হয়ে পড়ল। বিষয়টি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার বার্নাড ওয়েনরাব। '৭৪-এর ১৩ ডিসেম্বর সংখ্যায়।

তিন বছরেই বাংলাদেশের অর্থনীতি দেউলিয়া হয়ে গেছে। হাজার হাজার লোক অনাহারে মরছে। দুর্নীতি আর প্রশাসনিক অব্যবস্থার সংমিশ্রণে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। দেশে ব্যাপকহারে রাজনৈতিক হত্যা ও সংঘর্ষ চলছে।

বাংলাদেশ-পাকিস্তানের প্রাক্তন পূর্বাংশ যখন স্বাধীন হয় তখন শুভানুভূতি ও আন্তর্জাতিক সমর্থনের উচ্ছ্বাস বয়ে গেছিল। আগামী গ্রীষ্মকাল নাগাদ বাংলাদেশ ৩ বিলিয়ন ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে যেতো। কিন্তু সাহায্যকারী দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান পরিতাপ এই যে, বাংলাদেশ একটি প্রশাসনিক কাঠামো পর্যন্ত গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে এবং দুর্নীতির পঙ্কিলে ডুবে আছে। অধিকন্তু, জনসংখ্যা বৃদ্ধির মোকাবিলায় একটি সংঘবদ্ধ কৃষিনীতির রূপ দেয়ার এখনো বাকী আছে।

এদেশের জনগণ, রিলিফকর্মীরা এবং কূটনীতিবিদগণ দুনিয়ার সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এই দেশটির সমস্যাবলীর ব্যাপকতায় পর্যায়ক্রমে হতাশ ও শংকিত বোধ করছেন। জাতিসংঘের একজন অফিসার মন্তব্য করলেন, 'ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ১৯৮০ সালের পর যা ঘটতে পারে, বাংলাদেশে এ মুহূর্তেই তা ঘটছে।'

জনৈক বাংলাদেশী অর্থনীতিবিদ বলেন, 'আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি ভবিষ্যতে যে কি হবে, জানি না। নিজের পরিবারের ভোরণ-পোষণ আমার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে; অবস্থার অবনতি ছাড়া আমি আর কোনো পরিবর্তন দেখছি না।'

একজন উর্ধ্বতন সরকারি কর্মচারী বললেন, 'অবস্থা শুধু নৈরাশ্যব্যঞ্জকই নয়, মর্মান্তিকও বটে। নৈরাশ্যজনক এ জন্যই যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহ দেশের প্রতিকূলে বয়ে চলেছে। মর্মান্তিক এই জন্য যে, দেশের লোক অনাহারে মরছে। বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

অনাহারে হাজার হাজার লোক মারা গেছে। গত এক বছরে মোটা চালের দাম ২৪০ পার্সেন্ট বেড়েছে। প্রধান বিদেশী মুদ্রা অর্জনকারী পাটকলগুলোর উৎপাদন চার বছর আগের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ কমে গেছে। হাজার হাজার চাষী হাঁড়ি-পাতিল, চাষের বলদ, এমনকি জমিজমা বিক্রি করেও চাল কিনে খেয়েছে। আজ তারা

www.pathagar.com

নিঃস্ব হয়ে গ্রামের মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। ঢাকার রাস্তা দুঃস্থ মেয়েলোকে ছেয়ে আছে। এরা পয়সা ভিক্ষা করছে– কোলের নগ্ন শিশুগুলো এতো জীর্ণ-শীর্ণ যে, দেখে ভয় লাগে। ক্ষুধার্ত মানুষ চারপাশে নীরবে বসে আছে। একটি মহিলা মৃত শিশু বুকে করে আমেরিকান এ্যাম্বেসি ভবনের বাইরে বিলাপ করছে।

দুর্নীতির প্রত্যক্ষ প্রমাণের কাহিনীতে ঢাকা ভরপুর। জনৈক প্রাক্তন সরকারি কর্মচারী বললেন যে, 'দাতব্য ৭টি বেবীফুড টিনের মাত্র একটি এবং ১৩টি কম্বলের মধ্যে একটি মাত্র গরীবদের কাছে পৌছায়'। বাংলাদেশের রেডক্রসের প্রধান ও ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফা, শেখ মুজিবের পরিবার এবং শিল্প যোগাযোগ ও বাণিজ্য দফতরের পদস্থ আমলাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ শোনা যায়।

জনৈক কেবিনেট মন্ত্রীর কথা বলতে গিয়ে একজন বাংলাদেশী অর্থনীতিবিদ বললেন, 'যুদ্ধের পর তাকে (ঐ মন্ত্রীকে) মাত্র দুই বাক্স বিদেশী সিগারেট দিলেই কাজ হাসিল হয়ে যে, এখন দিতে হয় অন্ততঃ এক লাখটাকা (প্রায় ১২ হাজার ডলারের মতো)।'

ব্যবসার পারমিট ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য আওয়ামী লীগারদেরকে ঘুষ দিতে হয়। সম্প্রতি জনৈক অবাঙ্গালী শিল্পপতি ভারত থেকে ফিরে আসেন এবং শেখ মুজিবের কাছ থেকে তার পরিত্যক্ত ফার্মাসিউটিক্যাল কারখানাটি পুনরায় চালু করার অনুমোদন লাভ করেন। শেখ মুজিবের ভাগিনা শেখ মনি– উল্লেখযোগ্য যে, তিনি ঐ কারখানাটি দখল করে বসে আছেন– হুকুম জারি করলেন যে, তাকে ৩০ হাজার ডলার দিতে হবে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের পশ্চিমবঙ্গে যে চাল পাচার হয়ে গেছে তার পরিমাণ ৩ থেকে ১০ লাখ টন। শেখ মুজিবের সহকর্মীরা স্বীকার করেছেন যে, শাসক হিসেবে তার যোগ্যতা খুবই কম। খুব নগণ্য ব্যাপারাদি অনুমোদনের ফাইলে তার ডেস্ক সদ্য ভরে থাকে।

শেখ মুজিবকে ভাল করে জানেন– এমন একজন বাংলাদেশী বললেন, 'লোকজন তাকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করুক, তাকে দেশের সর্বময় কর্তা হিসেবে সম্মান করুক, এটা তিনি পছন্দ করেন। তার আনুগত্য নিজের পরিবার ও আওয়ামী লীগের প্রতি। তিনি বিশ্বাসই করেন না যে, তারা দুর্নীতিবাজ হতে পারে কিংবা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।'

www.pathagar.com

'৭৪-এর মহাদুর্ভিক্ষ

জন পিলজার, ডেইলী মেইল

বিদেশী সাংবাদিকদের দেখলেই শরণার্থী শিবিরের বুভুক্ষু মানুষ ছুটে আসে– বুঝি বা খাবার নিয়ে এসেছে এই আশায়। এমন দুর্ভিক্ষ স্মরণকালে দেখা যায়নি। দেখেননি লন্ডন থেকে প্রকাশিত ডেইলী মেইল পত্রিকার জন পিলজার। তার অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে মেইলের ১৭ ডিসেম্বর '৭৪ সংখ্যায়।

পশ্চিম এশিয়ার এবং দুর্ভিক্ষের প্রাচীনতম বিচরণভূমি বাংলাদেশে মহাদুর্ভিক্ষের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। এতো ব্যাপক দুর্ভিক্ষ সম্ভবতঃ অনেককাল দেখা যায়নি।

মৃত্যুর কোনো নিভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। এক হিসাব মতে, গত জুলাই মাসের বন্যার সমস্ত ফসল এবং পরবর্তী মৌসুমের বীজধান বিনষ্ট হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের এবং পার্শ্ববর্তী ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কয়েক লাখ লোক মারা গেছে।

ঢাকার 'সেভ দি চিলড্রেন ফান্ড'-এর কো-অর্ডিনেটর মি. মাইকেল প্রোসার বলেন, 'আমাদের চরম আশংকাই ফলে গেছে। আমরা এমন একটা বিপর্যয়ের সূচনাতে আছি যা আমি এই উপমহাদেশে গত ৩১ বছর দেখিনি।'

'বসন্তের আগে নতুন ফসল উঠবে না। বাইরের দুনিয়া থেকে যদি বাংলাদেশ প্রতি সপ্তাহে ১ লাখ টন খাদ্যশস্য ও তদসঙ্গে প্রয়োজনীয় মেডিকেল সাহায্য না পায়, আমার ভয় হচ্ছে, বহু লোকের জীবন বিপন্ন হবে।'

বস্তুতঃ বাংলাদেশের একটি অবিশ্বাস্য পরিসংখ্যান হচ্ছে এই যে, দেশের সবগুলো হাসপাতাল মিলিয়ে শিশুদের জন্য সর্বমোট ৭৫টি বেড আছে অর্থাৎ প্রতি দশ লাখে একটি।

মিরপুর শরণার্থী শিবিরের প্রকাণ্ড লৌহ-কপাটের বাইরে বহু নারী ও শিশু ভিড় করে আছে। গেটের সামনে একজন সিপাই পুরনো ৩০৩ রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে। তার কাজ আশ্রয় প্রার্থীদেরকে দূরে দূরে সরিয়ে রাখা। এসব শরণার্থীর অধিকাংশই ঢাকা থেকে ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত সবচেয়ে দুর্ভিক্ষকবলিত রংপুর জেলা থেকে এসেছে। অনেকেই এতোটা পথ হেঁটে এসেছে। অন্ততঃ দু'দিন তাই এদের পেটে কিছু পড়েনি। দেখে মনে হলে মাত্র দুটি ছাড়া সবকটি শিশুই বসন্ত রোগে আক্রান্ত। এরা এতো দুর্বল যে, গা থেকে মাছিও তাড়াতে পারে না। এদিকে রিলিফ ক্যাম্পেও তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

বরাবর যেমন হয়ে থাকে আমার ক্ষেত্রেও তাই হলো। একজন বিদেশী সাংবাদিককে দেখে ক্যাম্পের গেট খুলে দেয়া হলো। সুপারিন্টেন্ডেন্ট আব্দুস সালাম সবাইকে

www.pathagar.com

ভিতরে প্রবেশের জন্য ইঙ্গিত করলেন। আর ওমনি ওরা প্রাণপণ ছুটল ভিতরে। একথা আমি আক্ষরিক অর্থেই বলছি।

জনাব সালাম বললেন, 'এখানে তিন হাজার শরণার্থী রয়েছে। শুক্রবার থেকে সবাইকে দেয়ার মতো খিঁচুড়ি জুটবে না। শনিবার হয়তো কিছু আমেরিকান বিস্কুট পেতে পারি। যেভাবেই হোক আমরা যোগাড় করতে চেষ্টা করছি।'

এদেশে একটি শিশুকে একটু গুঁড়াদুধ ও একমুঠো দানা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে মাত্র ২৫ পেন্স খরচ হয়; শুক্রবার থেকে আব্দুস সালাম তাও পাবেন না।

একটি তিন বছরের শিশু– এতো শুকনো যে, মনে হলো যে, যেন মায়ের পেটে থাকাকালীন অবস্থায় ফিরে গেছে– আমি তার ছোট হাতটা ধরলাম। মনে হল তার চামড়া আমার আঙ্গুলে মোমের মতো লেগে গেছে।

এই দুর্ভিক্ষের আর একটি ভয়ঙ্কর পরিসংখ্যান এই যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর হিসাব মতে, ৫০ লাখ মহিলা আজ নগ্নদেহ। পরিধেয় বস্ত্র বিক্রি করে তারা চাল কিনে খেয়েছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে এবং আমার গাড়ি ইসলামিক মানব কল্যাণ সমিতি আঞ্জুমান-এ-মফিদুল ইসলাম-এর লরীর পেছনে পেছনে চলেছে। এই সমিতি রোজ ঢাকার রাস্তা থেকে দুর্ভিক্ষের শেষ শিকারটিকে কুড়িয়ে তুলে নেয়। সমিতির ডাইরেক্টর ডাঃ আব্দুল ওয়াহিদ জানালেন, 'স্বাভাবিক সময়ে আমরা হয়তো কয়েক ডজন ভিখারীর মৃতদেহ কুড়িয়ে থাকি কিন্তু এখন মাসে অন্ততঃ ৬০০ লাশ কুড়াচ্ছি– সবই অনাহারজনিত মৃত্যু। লরীটা যখন গোরস্থানে গিয়ে পৌছল ততক্ষণে ৭টি লাশ কুড়ান হয়েছে। এদের মধ্যে ৪টি শিশুর। সব কয়টি বেওয়ারিশ।

লাশগুলো সাদা কাপড়ে মুড়ে সংক্ষিপ্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর গোরস্থানের এক প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে গত মাসে দুর্ভিক্ষে যারা মারা গেছে তাদের কবর খুঁড়ে নতুন দাফনের জায়গা করা হয়।

এ ধরনের দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি। প্রকৃতি আর মানুষ মিলে যদি কখনো বেলসেন আর অশউৎসের অসংখ্য কবর নতুন করে রচনা করার চেষ্টা করে থাকে, তাহলে তারা এই গোরস্থানে সফল হয়েছে।

যতোদূর দৃষ্টি যায় শুধু কংকাল আর কংকাল– বোধকরি হাজার হাজার। প্রথমে লক্ষ্য করিনি। পরে বুঝতে পারলাম অধিকাংশ কংকালই শিশুদের।

www.pathagar.com

দুর্নীতির খেসারত

পিটারগীল, ডেইলী টেলিগ্রাফ

'৭৫ সালের ৬ জানুয়ারি লন্ডনের ডেইলী টেলিগ্রাফে ছাপা হয়েছে পিটার গীলের পর্যবেক্ষণে। দুর্ভিক্ষে মানুষ মরছে। কে সৃষ্টি করেছে এই দুর্ভিক্ষ? এর পেছনে রয়েছে দুর্নীতি। আর এ দুর্নীতির হোতা হলেন আওয়ামী-বাকশালী দুঃশাসনের জনক শেখ মুজিব নিজেই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান অর্থনৈতিক বিপর্যয়-সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ গালিগালাজ করে চলেছেন। এদিকে বাংলাদেশ ক্রমেই মানবিক দুঃখ-কষ্টের এক অজানা অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

গ্রাম-বাংলায় প্রচুর ফসল হওয়া সত্ত্বেও একটি ইসলামিক কল্যাণ সমিতি গত মাসে ঢাকার রাস্তা, রেলস্টেশন ও হাসপাতালগুলোর মর্গ থেকে মোট ৮৭৯টি মৃতদেহ কুড়িয়ে দাফন করেছে। এরা সবাই অনাহারে মরেছে।

সমিতিটি ১৮৭৪ সালের শেষার্ধে ২৪৩টি লাশ কুড়িয়েছে– সবগুলোই বেওয়ারিশ। এগুলোর মধ্যে দেড় হাজারেরও বেশি রাস্তা থেকে কুড়ানো। ডিসেম্বরের মৃতের সংখ্যা জুলাইয়ের সংখ্যার সাতগুণ এবং অক্টোবরের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় কুড়ানো সংখ্যারও প্রায় দ্বিগুণ।

গেল সপ্তাহে ঢাকার একমাত্র আন্তর্জাতিক হোটেলের ৫০০ গজের মধ্যে একটি যুবকের মৃতদেহ শীতের রোদে পড়েছিল। জনাকীর্ণ এয়ারপোর্ট রোডে গাড়ি ও পথচারীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এর পাশ দিয়ে চলাচল করেছে। পরে লাশটি সরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

গ্রাম-বাংলার ছিন্নমূল হতাশ মানুষেরা আজ ঢাকার পেশাদার ভিখারীদের স্থান নিয়েছে। পিতা শিশুদের নিয়ে রাস্তার চত্বরে নির্জীবের মতো বসে আছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

সপ্তাহখানেক আগে নতুন জরুরি অবস্থার নামে শেখ মুজিব একচ্ছত্র ক্ষমতা হাতে নিয়েছেন। মনে হয় দৃঢ় কিংবা কার্যকরী সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা তার নেই। তার দেশবাসী কেউ কেউ তাকে রাজা কেনিয়্যুটের সাথে তুলনা করছেন– তিনি অরাজকতা ও আর্থিক অব্যবস্থারূপ সমুদ্রকে পিছু হটতে নিষ্ফল হুকুম জারি করে চলেছেন।

মন্ত্রীরা ব্যাখ্যা করছেন, নিরাপত্তা বাহিনীর গ্রেফতার করার ও বিনা বিচারের আটক রাখার ক্ষমতাকে আইন-আদালতের এখতিয়ারের বাইরে সরিয়ে তাদের 'মনোবল বাড়ানোর' জন্য জরুরি অবস্থা একটি পরিকল্পিত কৌশল মাত্র।

www.pathagar.com

অত্যন্ত ধিকৃত রক্ষীবাহিনী খোদ প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে। গেল বছর বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট এই বাহিনীকে একটি 'অবৈধ' এবং 'সম্পূর্ণ নিয়মবিরোধী' কার্যকলাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিল। শেখ মুজিবকে আজ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বোঝা বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। ছোটখাট স্বজনপ্রীতির ব্যাপারে তিনি ভারি আসক্তি দেখান। ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া বাকী পড়ে থাকে।

সিনিয়র অফিসাররা অভিযোগ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী তাদের ক্ষমতা খর্ব করে চলেছেন। তিনি জুনিয়র অফিসারদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন বিশেষ করে যাদের সঙ্গে তার পারিবারিক কিংবা রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে।

অধিকাংশ পর্যবেক্ষকের বিশ্বাস, আর্থিক ও রাজনৈতিক সংকট রোধ করার কোনো সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমও সরকারের নেই। রাজনৈতিক মহল মনে করেন, মুজিব খুব শিগগিরই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক বুনিয়াদ আরো নষ্ট করে দেবেন। তিনি নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করার পরিকল্পনা করছেন। নতুন জরুরি অবস্থার ফলে আওয়ামী লীগের ভিতরে তার বিরুদ্ধে সমালোচনা স্তব্ধ হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

বেওয়ারিশ লাশের সংখ্যা বাড়ছে

কেভিন রেফার্টি, ফিনান্সিয়াল টাইমস

শহরে বুভুক্ষু মানুষের ভিড় আর মৃত্যু। লাশের মিছিলে হারিয়ে যায় অগণিত বণি আদম। কেউ চেনে না কাউকে। কে নেবে এই লাশের দায়িত্ব? লন্ডন থেকে প্রকাশিত ফিনান্সিয়াল টাইমস পত্রিকায় ১৯৭৫ সালের ৬ জানুয়ারি কেভিন রেফার্টি পরোক্ষে এ প্রশ্ন তুলেছেন।

সম্প্রতি FAO-এর সেক্রেটারি জেনারেল ড. বোয়েরমা বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ এড়াবার জন্য সমৃদ্ধশালী দেশগুলোর কাছে আরো অধিক পরিমাণ খাদ্য সরবরাহের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু একই সময়ে নেতৃস্থানীয় এবং প্রায়ই উচ্চপদস্থ বাঙ্গালীদের কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন যে, সাহায্যকারী দেশগুলোর বাংলাদেশ থেকে কার্যক্রম প্রত্যাহার করে বাংলাদেশকে নিজের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত।

বিশাল উন্নয়ন পরিকল্পনার স্বপ্ন বাংলাদেশে এসে শেষ হয়ে গেছে। অন্যত্র বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য ধনী দেশগুলো সাহায্য করছে– তারা ভাবতে পারছে যে, সেসব দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে তারা সহায়তা করছে। তারা আরো ভাবতে পারছে যে, সেসব দেশের লোক ধীরে ধীরে অধিকতর ধনবান হবে এবং কয়েক বছরে কিংবা কয়েক দশকে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে 'যাত্রা' শুরু করতে পারবে। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারে তারা বড়জোর এটুকু ভাবতে পারে যে, তারা এদেশে টাকা ঢালছে যাতে এ দেশের গরীব জনসাধারণ আরো গরীব না হয়।

স্পষ্টতঃই বাংলাদেশে পরাজয়ের সংগ্রাম চলছে। দিনে দিনে বাংলাদেশ আরো গরীব হচ্ছে। কল্পনা করা শক্ত কিন্তু বাস্তব এটাই যে, আজকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাধীনতার সময়কার অবস্থা থেকে অনেক শোচনীয়। খাদ্য ঘাটতি আগের চেয়ে অনেক বেশি। শতকরা ৮০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পাট-এর উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ কমে গেছে। শিল্প উৎপাদন এখনো ১৯৬৯-৭০-এর মাত্রায় পৌঁছায়নি– যদিও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক মিলিয়ন।

সাহায্যকারী দেশগুলোর উদ্বেগের বিষয় এই যে, বাংলাদেশের 'ব্যালেন্স অব পেমেন্ট'-এর মোট ঘাটতি পূরণ করে তারা দেখতে পাচ্ছেন যে, দুর্নীতি ও অপচয়ের ফলে দেশটির উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন প্রকল্পের শেষ ধাপে উন্নয়ন প্রচেষ্টা নিশ্চিত করার জন্য শতকরা ১০ ভাগ বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন খুব বেশি। আমদানির জন্য প্রায় ১.৪ বিলিয়ন ডলার আবশ্যক। কিন্তু চলতি বছরে রফতানি থেকে খুব আশাবাদী হয়ে হিসাব করলেও ৪৫ মিলিয়ন ডলার অর্জিত হবে না। ফলে ১.১ বিলিয়ন ডলার ঘাটতি থেকে যায়। এই বিরাট ঘাটতি বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের

www.pathagar.com

সাহায্যে পূরণ করতে হবে।

কয়েকটি সাহায্যকারী দেশ এ বছরে শিল্প-কারখানার জন্য অত্যাবশ্যকীয় অতিরিক্ত কারিগরি যন্ত্র-সরঞ্জাম পাঠিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। কাস্টমস থেকে মাল ছাড়াবার জন্য তাদের ১৫০ পার্সেন্ট শুল্ক ও ট্যাক্স দিতে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ যে অবস্থায় চলছে তাতে সাহায্যকারী দেশগুলো খুব ক্ষুব্ধ। বাংলাদেশ সরকার অনেকগুলো তথাকথিত 'সমাজতান্ত্রিক' কর্মসূচি গ্রহণ করছে, যার ফলে শ্রমিক নেতাদের লালসা বাড়ান ছাড়া আর কিছু সাধিত হয়নি। এদিকে প্রতিটি সিদ্ধান্ত সরকারি লাল ফিতার চাপে এমনি আটকিয়ে থাকে যে, কোনো ফলপ্রসূ পদক্ষেপ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে যে, 'র‍্যাকেটিয়ার্স' ও মুনাফা বাজরা নির্বিঘ্নে বিপুল মুনাফা কুড়াচ্ছে। কেননা, রাজনৈতিক চাঁইদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে।

সুবিস্তৃত ইউএন 'এইড অপারেশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা মি. টনী হেগেন হিসাব করে দেখেছেন যে, রিলিফ সামগ্রীর সাত ভাগের এক ভাগ মাত্র প্রকৃত দুঃস্থ লোকদের হাতে পৌঁছেছে।

শুধু নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দুর্নীতির মাধ্যমেই যে আওয়ামী লীগ দেশকে ধ্বংস করেছে তা নয়। ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতি ও গ্রাম-বাংলায় দুর্ভিক্ষ গ্রামের সামাজিক কাঠামোর ওপরে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। অনেক জেলায় বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে কৃষকরা তাদের জমি-জিরাত বিক্রি করে খাদ্য কিনতে বাধ্য হচ্ছে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, উত্তরবঙ্গে ১ লাখ বিঘা জমি হস্তান্তরের দলিল সম্পাদিত হয়েছে। এসব জমি প্রধানতঃ আওয়ামী লীগের স্থানীয় চাঁইরা সস্তায় কিনে নিয়েছেন।

পুরান ঢাকায় নদীর পাড়ে উপবিষ্ট আটজনের একটি পরিবারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। এরা এইমাত্র খাওয়া শেষ করেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা কোথা থেকে এসেছে?' ওরা বলল, 'ফরিদপুর থেকে।' প্রশ্ন করলাম, 'টাকা-পয়সা কতো কি আছে?' ওরা জবাব দিল, 'খাবার কিনে সব খরচ করে ফেলেছি।' 'তবুও' আমি আবার প্রশ্ন করলাম, 'কতো খাবার তোমাদের অবশিষ্ট আছে? 'এইমাত্র শেষটুকু খেয়ে নিয়েছি।' ওরা জবাব দিল।

www.pathagar.com

যেখানে ক্ষুধাই একমাত্র সত্য

জুলিও শেরার, কানসাস টাইমস

ক্ষুধার মূর্ত প্রতীক শরণার্থী শিবিরের লোকগুলো। অস্থি, চর্ম, হাড্ডিসারশূন্য এই লোকগুলোর চেহারা মুজিব হেরেমে ছায়াপাত করেছিল কি না কে জানে? তবে কানসাস টাইমসের জুলিও শেরার ঠিকই এঁকেছিলেন তাদের ছবি। ১৯৭৫ সালের ২০ জানুয়ারি প্রকাশিত হয় এ বর্ণনা-চিত্র।

মিরপুরে একজন সৈন্য 'শটগান' ঝুলিয়ে রিফিউজী ক্যাম্প পাহারা দিচ্ছে। গেটের ভিতরে কাঠ, আবর্জনা ও কাদা স্তূপাকার হয়ে আছে। মাঝখানে একটি ছোট্ট বদ্ধ ডোবা। ডোবার এক পাশে পুরুষ ও অপর পাশে মেয়ে রিফিউজীরা তাদের রোজকার বরাদ্দ খাবারের জন্য 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের চোখগুলো গর্তে ঢোকা, দেহগুলো হাড্ডিসার। বরবটির খিঁচুড়ির বড় হাঁড়িটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ওরা তাকায় যেন কোনো অজানার গভীর থেকে। কোনো এক রহস্যজনকভাবে ওদের রক্তহীন চিমসে যাওয়া দেহের ভিতরে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস কাজ করে চলেছে। শিশুরা ব্যারাকের পাকা মেঝেতে ঘুমায়, কাঁদে, চিৎকার করে। নগ্ন অথবা অর্ধনগ্ন ওরা। ওদের গায়ের চামড়া ক্ষতে ছেয়ে আছে, চোখ থেকে পিঁচুটি গলে পড়ছে। ওদের গায়ের চারপাশে মাছি ছুটে বেড়ায়।

আবদুল মজিদ– যিনি ক্যাম্পের চার্জে আছেন– বললেন, তিনি এসব সহ্য করতে পারছেন এই জন্যই যে, এগুলো তার গা-সওয়া হয়ে গেছে। তার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, রিফিউজীদের কষ্ট বলে কিছু নেই, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগেই ওদের আত্মা বেরিয়ে যায়। 'ওরা ক্ষুধার মূর্ত রূপ'- বললেন তিনি।

কলেরা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। প্রতি হাজারে দু'জন কিংবা আরো বেশি লোক কলেরায় মারা যাচ্ছে। সঠিক হিসাব কারো কাছে নেই। হেলথ অফিসাররা হাল ছেড়ে দিয়েছেন। তারা স্বীকার করেছেন, 'মহামারী আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।' কলেরার পাশাপাশি ডায়রিয়া আক্রমণ চালিয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রোগীর দেহের ওজন ১০% কমে যায়। শরীরের লবণ বেরিয়ে যায়। সে পড়ে থাকে নির্জীবের মতো। ঘুমায়ও না-মরেও না। জীবন ও মৃত্যুর টানাপোড়েনে দোল খেতে থাকে। আমরা তাদেরকে মহাখালী হাসপাতালে দেখেছি।

জয়নুল আবেদীন বাংলাদেশের সবচেয়ে সুপরিচিত শিল্পী। তার আঁকা ছবিতে বাংলাদেশের দুঃখ-দৈন্যের চিত্র ফুটে ওঠে, 'কেননা, আমার এ চোখ আর কিছুই দেখতে পায় না'; তার ছবি অনাহার মৃত্যুকে বর্ণনা করে, 'কেননা, অন্য কিছু আমার অন্তরকে স্পর্শ করে না।'

হৃষ্টপুষ্ট, গোলগাল গড়নের স্বাস্থ্যমন্ত্রী– যিনি মেহমানদেরকে চা, বিস্কুট আর কলা দিয়ে আপ্যায়িত করেন– বললেন যে, 'শতকরা ৫০ জন বাঙ্গালীই কম-বেশি ক্ষুধার্ত।'

www.pathagar.com

মুজিবের তৈরি বিপর্যস্ত এলাকা

জেকুইস লেসলী, লন্ডন গার্ডিয়ান

ভয়াল দুর্ভিক্ষের ছোবলে দেশ উজাড়। কিন্তু অহমিকার প্রতিভূ মুজিব তার রাজধানীকে চকচকে রাখতে নিরন্ন মানুষদের ধরে নিয়ে বন্দী শিবিরে রাখলেন। অনেকের মতো এই বন্দী শিবির দেখেছেন লন্ডন গার্ডিয়ানের জেকুইস লেসলী। তার অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ণনা প্রকাশিত হয় '৭৫-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি।

'আমাদেরকে খাবার দাও, নতুবা গুলি করে মেরে ফেল' ডেমরা ক্যাম্পের এক বৃদ্ধ বিষণ্নভাবে বলে উঠলেন। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত ডেমরায় নিরাশার মর্মস্পর্শী অনুভূতি স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

প্রায় মাসখানেক আগে সশস্ত্র সৈন্য ও পুলিশ ৫০,০০০ বাসিন্দাকে ঢাকার বস্তি এলাকায় তাদের ঘর-বাড়ি থেকে উৎখাত করে একটি অনুর্বর দ্বীপের ক্যাম্পে নিয়ে আসে। শেখ মুজিবুর রহমান দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার এবং শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখার পর সরকার যে কয়টি পদক্ষেপ নিয়েছেন– এটা তার একটি।

কিছু সংখ্যক পর্যবেক্ষক বিশ্বাস করেন যে, এই উৎখাত অভিযান সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাস দূর করার মতলবেই পরিচালিত হয়েছে। অভিযান শুরু হবার সপ্তাহখানেক পরে বাংলাদেশের পূর্তমন্ত্রী সোহরাব হোসেন এই উৎখাত কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন এবং বলেন, 'বস্তিগুলো ছিল এমন জায়গায় যেখানে সামাজিক অসন্তোষ সংঘবদ্ধভাবে রাজনৈতিক বিক্ষোভের আকার দেয় এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ জন্ম লাভ করে।'

সরকারের এই পদক্ষেপে বড়জোর ঢাকা শহরের গায়ে একটু প্রসাধন মাখাবার চেষ্টা প্রতিফলিত হয়। তবে এতে ঢাকার চেহারা বদলাবে না। ঢাকা এয়ারপোর্ট রোডের পাশে একটি বস্তি সম্পূর্ণ সাফ করে দেয়া হয়েছে। একজন বিদেশী কর্মকর্তা বললেন, সারা এলাকাটা 'সরকারের পক্ষে আতংকিত হবার কারণ ছিল।'

রিপোর্টাররা ডেমরা ক্যাম্পের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন আর বাসিন্দারা একের পর এক খাদ্য ও ওষুধের জন্য অনুনয়-বিনয় করতে লাগল। আগন্তুকদের কয়েকটি পর্ণকুটীরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে কতগুলো মুমূর্ষু লোক মাটিতে পড়ে আছে। এক মা জনৈক সাংবাদিকের হাত টেনে নিয়ে তার জরাগ্রস্ত শিশুটির পেটের ওপর চেপে ধরল।

এখানকার দুঃখ-কষ্ট খাদ্যভাব প্রকোট হয়নি। বরং মনে হয় পরিকল্পনার অভাব এবং লোকজনের ভাগ্যের প্রতি সরকারের উদাসীনতার ফল। ক্যাম্পগুলো না খোলা পর্যন্ত এগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ত্রাণ পুনর্বাসন এজেন্সিগুলোকে জানানোই হয়নি। ঢাকায় 'সেলভেশন আর্মি'র প্রধান প্রতিনিধি ইভা ডেন হারটগ জানালেন,

www.pathagar.com

'কাউকে কিছুই জানান হয়নি। সরকার চান না যে, এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক। তারা চান এটা বিস্মৃতিতে তলিয়ে যাক।'

এক বাঙ্গালী মহিলা তার মৃত শিশুকে কোলে করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভিড় ঠেলে ঢুকে দাফন করার মতো এক টুকরো কাপড়ের জন্য ক্যাম্পের অফিসারদেরকে অনুরোধ করতে লাগল। মহিলাটি জানাল যে, সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুরোধ করেছে, কিন্তু অফিসাররা তাকে এই বলে সরিয়ে দিয়েছে যে, 'যে কোনো জিনিসের জন্য আবেদনপত্র চাইতে কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।'

যখন জনৈক রিপোর্টার ক্যাম্পের একজন বাসিন্দার কাছে মন্তব্য করলেন যে, শেখ মুজিব যাকে বহু বাঙ্গালী জাতির জনক হিসেবে সম্মান করে– যে জেলা থেকে এসেছেন, তিনিওতো সেই জেলা থেকেই এসেছেন, লোকটি তখন তাকে থামিয়ে দিল এই বলে যে, 'ও কথা আর মুখে আনবেন না।'

www.pathagar.com

বাংলাদেশ এক বিরাট ভুল

ব্রাডফোর্ডশায়ার টাইমস

দু'চোখ জুড়ে অন্তহীন আশা-প্রিয় স্বাধীনতা। কিন্তু ক্ষুধা, জরা মৃত্যু আর সীমাহীন নির্যাতনের মানেই কি স্বাধীনতা? জীবনধারণের সামান্যতম ব্যবস্থাও যেখানে নেই সেখানে স্বাধীনতাকে এক বিরাট ভ্রান্তি বলেই মনে হয়। এই আলোকে '৭৫-এর ২১ মার্চ ব্রাডফোর্ডশায়ার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ বাংলাদেশ যেন এক বিরাট ভুল। একে যদি ভেঙ্গেচুরে আবার ঠিক করা যেতো।

জাতিসংঘের তালিকায় বাংলাদেশ সবচেয়ে গরীব দেশ। বস্তুতঃ এর কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। ১৯৭০ সালের শেষে যখন বন্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে দেশের দক্ষিণ অঞ্চল ডুবে যায় তখন দুনিয়ার দৃষ্টি এ দেশের অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ওপর নিবদ্ধ হয়। বিরাট রিলিফের কাজ সবে শুরু হয়েছিল এমনি সময়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দুভাষী সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষের বহ্নি ধুমায়িত হতে থাকে। ১৯৭১ সালে সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষীদের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের অপ্রতিরোধ্য সাফল্যের পরই বাঙ্গালীরা তাদের অভিযোগ প্রকাশ্যে সোচ্চার হয়ে উঠে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ যখন শুরু হল তখন জয়ের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। একমাত্র ভারতের সাগ্রহ সামরিক হস্তক্ষেপের ফলেই স্বল্পস্থায়ী– কিন্তু ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাকিস্তানের পরাজয় ঘটে এবং বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়। বিশ্বের জাতিপুঞ্জ আবার সাহায্যার্থে দ্রুত এগিয়ে আসল– এবার তাদের নিজ নিজ প্রাধান্য বজায় রাখার তাগিদে।

উড়োজাহাজ থেকে মনে হয় যেকোনো প্রধান শহরের মতো রাজধানী ঢাকাতেও বহু আধুনিক অট্টালিকা আছে। কিন্তু বিমানবন্দরে অবতরণ করা মাত্রই সে ধারনা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। টার্মিনাল বিল্ডিং-এর রেলিং ঘেঁষে শত শত লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। কেননা তাদের অন্যকিছু করার নেই। আর যেহেতু বিমানবন্দর ভিক্ষা করার জন্য বরাবরই উত্তম জায়গা। ওসব আধুনিক অট্টালিকা সবগুলোই বস্তুতঃ অসমাপ্ত। পাকিস্তানীরা চলে যাবার পর সিমেন্ট ও আন্তর্জাতিক সাহায্য ফুরিয়ে গেছে। তখন থেকে এগুলোর কাঠামো সাজানো রয়েছে। যেগুলোর নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে এসেছিল সেগুলোও বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সিমেন্টের মতো রং-ও কালোবাজারে অগ্নিমূল্য না দিলে পাওয়া যায় না।

বস্তুতঃ বাংলাদেশ কালোবাজারের ওপরই চলছে। মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও 'শ্যানেল' পারফিউম থেকে শুরু করে শিশুদের মনোহারী খেলনায় দোকানপাট জাম হয়ে

www.pathagar.com

রয়েছে। অগ্নিমূল্য দিলে সবকিছুই পাওয়া যায়। যেমন চিনি এক পাউন্ড (প্রায় আধাসের)= ১৬ টাকা। লবণেরও তাই দাম। বাঙ্গালীদের প্রধান খাদ্য চালের দাম প্রতি পাউন্ড ২০ পেন্স (৪ টাকা)।

এই দ্রব্যমূল্যের পাশাপাশি একজন বাঙ্গালী দিনমজুরের দৈনিক উপার্জন মাত্র ৫ টাকার মতো, অর্থাৎ ৩০ পেন্স। তাছাড়া প্রতিদিন সে যে কাজ পাবে তারো কোনো নিশ্চয়তা নেই। বাংলাদেশ এক অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতির মুঠোয়। গত পনের মাসে চালের দাম চার গুণ বেড়েছে। সরিষার তেলের দাম তিন গুণ ও কেরোসিন তেলের দাম হয়েছে দ্বিগুণ। কিন্তু মাইনে বাড়েনি কারো। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নেই যে, এই মুদ্রাস্ফীতির কারণ বাজারদরের কারসাজি এবং ব্যাপক দুর্নীতি– যে দুর্নীতি এই হতাশাগ্রস্ত দেশটির সর্বস্তরে ছড়িয়ে আছে।

ঢাকা এবং অন্যান্য বড় শহরে যেমন খুলনায় যারা ভিড় করে আছে, তারা গ্রাম-বাংলায় যারা রয়েছে তাদের চাইতে অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান। কেননা, তাদের হাত পেতে কিছু পাওয়ার আশা আছে। গ্রামের লোকেরা মনে করে যে, এসব শহরের রাস্তাগুলো বুঝি সোনায় মোড়া। ফলে প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার বুভুক্ষ-অর্ধভুখ মানুষ শহরে এসে ভিড় করছে। প্রতিটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট হয়ে যায়, আর প্রতিটি ফাঁকা জায়গায় গড়ে ওঠে নিঃস্ব ক্লান্ত চাষীদের পর্ণকুটীর। এমনি করে মাদুর, চাটাই, বাঁশ কিংবা দু'এক টুকরো কাঠ বা একখণ্ড লোহার জোড়াতালি দেয়া। এসব ক্ষুদ্র ছাপরার স্তূপীকৃত 'বস্তিগুলো' ছিল হাজার হাজার গ্রামত্যাগী ছিন্নমূল মানুষের বাসভবন। কিন্তু দুই মাস আগে প্রতিটি ঘর ভেঙ্গে সমান করে দেয়া হয়েছে অধিবাসীদেরকে জোর করে শহরের সীমানার বাইরে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

দৃশ্যতঃ সরকার বর্বরোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে শহরগুলোকে পুঁতিগন্ধময় বস্তিমুক্ত করার সত্যিকার তাগিদে। যেভাবে বস্তি বেড়ে উঠছিল, তাতে বাংলাদেশের শহরগুলো অচিরেই কলিকাতায় পরিণত হতো, যেখানে কর্তৃপক্ষ বস্তি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা হতাশ হয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সরকারের ভয়ও ছিল যে, বস্তিগুলো প্রতিটি বড় শহরে রাজনৈতিক বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। সশস্ত্র হামলার সাম্প্রতিক নাটকীয় বৃদ্ধিতে সম্ভবতঃ এর ইঙ্গিত রয়েছে।

আমি এসব ক্যাম্পের একটি দেখেছি ঢাকার বাইরে টঙ্গীতে, অপরটি খুলনা শহর থেকে দু'মাইল দূরে মুজগুনিতে। এগুলো নীচু ধান জমির উন্মুক্ত এলাকায় অবস্থিত, আসছে বর্ষায় যেখানে ২/৩ ফুট পানি জমবে। টঙ্গীতে ২৫ হাজার উদ্বাস্তু বাস করছে। এখানে আন্তর্জাতিক রিলিফ সংস্থাগুলোর একটি গ্রুপ একযোগে সাহায্যের কাজে এগিয়ে এসেছে। এদের মধ্যে 'সেভ দি চিলড্রেন' প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। মুজগুনিতে অবস্থা আরো শোচনীয় দেখলাম, কেননা সেখানে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নেই। এ দুটি

www.pathagar.com

ক্যাম্প– বস্তুতঃ বস্তি উচ্ছেদের পর বাংলাদেশের সবকয়টি ক্যাম্পই ভেঙ্গে ফেলা বস্তিগুলোর নিছক প্রতিকৃতি মাত্রঃ সেই একই জোড়াতালি দেয়া অস্থায়ী কুঁড়েঘর। অধিবাসীদের মনোবল আরো ভেঙ্গে পড়েছে। সাড়ে তিন লাখ থেকে চার লাখ উর্দু ভাষাভাষী বিহারী, যারা এখনো বাংলাদেশে পড়ে আছে, তাদেরও একই সমস্যা।

সবগুলো ক্যাম্পই রোগের উৎপাদন ক্ষেত্র। বসন্ত, টাইফয়েড, আমাশয়, কলেরা এবং যক্ষ্মা বাংলাদেশে বরাবর লেগেই আছে। পুষ্টিহীনতায় দুর্বল ক্যাম্পবাসীদের কি বিপদ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

যখন দেখা যায়, যেমন আমি দেখছি, গোটা গ্রামের লোক অনাহারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; যখন শোনা যায়, যেমন আমি শুনছি মা বিলাপ করছে চোখের সামনে তার সন্তান খাবারের অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে' যখন বলা হয়, যেমন আমাকে বলা হয়েছে, অমুক গ্রামে কেউ গান গায় না, কেননা তারা কি গাইবে? যখন দেখা যায়, যেমন আমি দেখেছি, একটি শিশু তার চোখে আগ্রহ নেই, গায়ে মাংস নেই, মাথায় চুল নেই, পায়ে জোর নেই, অতীতে তার আনন্দ ছিল না, বর্তমান সম্পর্কে তার সচেতনতা নেই এবং ভবিষ্যতে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না সে, তখন সাহায্যের প্রয়োজন এবং সাহায্যের মূল্য কতোই না ভয়ংকররূপে বাস্তব হয়ে উঠে।

www.pathagar.com

একটি বীভৎস ক্যাম্পে

জু গেন্ডলম্যান, শিকাগো ডেইলী নিউজ

দুর্ভিক্ষে অগনন মানুষের মৃত্যুর খবর তখন বিশ্বের কারো জানা বাকী ছিল না। গড়ে উঠেছিল রিফিউজী ক্যাম্পের বর্ণনা থেকেই তখনকার বাংলাদেশ স্পষ্ট হয় বিশ্ববাসীর কাছে। এই কাহিনী তুলে ধরেছেন শিকাগো ডেইলী নিউজ পত্রিকায় জু গেন্ডলম্যান '৭৫–এর ২৬ মার্চ সংখ্যায়।

এমন এক সময় ছিল, যখন হাতেম আলী রিকশা চালিয়ে তার পরিবারের (সংখ্যায় তারা সাতজন) ভরণ–পোষণ করতে পারত।

তারপর একদিন সরকার তাকে তার ঢাকার বস্তির বাড়ি থেকে জোর করে উঠিয়ে শহরের বাইরে টঙ্গীতে এনে ফেলল। সেখানে তাকে একফালি জমি দিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে বলা হল। ঢাকার বস্তিগুলো ইতিমধ্যে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

হাতেম আলী ঢাকায় রিকশা চালাতে চেয়েছিল। কিন্তু ৪০ টাকা (প্রায় ৬ ডলার) ঘুষ না দিলে অফিসাররা তাকে লাইসেন্স দেবে না। সে যখন বলল এই 'ফী' সে দিতে পারবে না তখন তারা ক্ষেপে গিয়ে ইংরেজীতে তাকে প্রশ্ন করা শুরু করল। সেও তাদের মুখের ওপর বাংলায় জবাব দিল "ইংরেজী জানব কেন? যদি ইংরেজীই জানতাম তাহলেতো কেরানীই হতাম, রিকশা টানতাম না।" সুতরাং হাতেম আলী টঙ্গীতেই আছে।

আহন বানুর স্বামী যখন রিকশাওয়ালা ছিল তখন তাদের সচ্ছলতা ছিল। আহন বানু নিজেও ঢাকায় আয়া বা 'বেবী সিটার' হিসাবে সপ্তায় ৩০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) উপার্জন করত। কিন্তু সরকার তাকে ঢাকার বস্তি থেকে উঠিয়ে টঙ্গীতে নিয়ে এসেছেন।

হাতেম আলী আর আহন বানু। টঙ্গীতে নিয়ে আসা ৬,৫৭৫টি অনুমোদিত ও ২,০০০ অননুমোদিত পরিবারের ৫৫,০০০ লোকের মধ্যে মাত্র দু'জন। এরা আজ এখানে– ভয়াবহ বন্যা হল। বন্যার পরপরই দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। ২৭,০০০ (সরকারি হিসাবে) থেকে ৩,০০,০০০ (বেসরকারি হিসাবে) লোক প্রাণ হারাল। আর হাজার হাজার বাঙ্গালী খাদ্য, আশ্রয় আর কাজের জন্য ছুটে চলল।

তাদের ভরসা ছিল শহরগুলো এবং অনেক ছিন্নমূল মানুষের ধারণায় বাংলাদেশের রাজধানী ছিল "সোনার ঢাকা"। কিন্তু রূপকথার কাহিনীর মত সে সোনা শুধু ছলনা প্রমাণিত হয়েছে।

ঢাকায় আসামাত্রই রিফিউজীদেরকে বস্তির জমিতে আইনতঃ তাদের কোন অধিকার ছিল না, কিন্তু রাজনৈতিক দিক দিয়ে তারা ক্ষমতাশালী ছিল।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ রেডক্রসের প্রধান গাজী গোলাম মোস্তফা "সত্যিই ভয়ঙ্কর লোক"। তার প্রসঙ্গ তুললেই বাংলাদেশ সরকারের মেজাজ চড়ে যায়– মেজাজ আরো চড়ে যায় বস্তির কথা বললে।

জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর প্রথম ক্ষমতা প্রদর্শনে শেখ মুজিব বস্তিগুলো ভেঙ্গে সমান করে দিয়ে রিফিউজীদের ঢাকার বাইরে বিভিন্ন সরকারি ক্যাম্পে পুনর্বাসন করেছেন। ঢাকার অধিবাসীরা এতে খুশী হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহল বলেন, মুজিবের এ ব্যবস্থা গ্রহণের আংশিক কারণ হল এই যে, বস্তিগুলোতে গাজী গোলাম মোস্তফার প্রাধান্য ছিল।

বিদেশী সাংবাদিকরা– যারা স্বল্পকালের জন্য বাংলাদেশ সফরে আসেন–তাদের কাছে গত কয়েক মাসে টঙ্গী একটি চাঞ্চল্যকর 'হরর স্টোরি' হয়ে উঠেছে। ১২টি কেন্দ্র, ১২টি গ্রাম, অসংখ্য ভাঙ্গাচুরা অস্থায়ী কুঁড়েঘর– দৃশ্যতঃ যেন একটা গোটা বস্তিকেই উঠিয়ে আনা হয়েছে।

অথচ টঙ্গীর জন্য বস্তুতঃ কোন অর্থ বরাদ্দ নেই। রেডক্রস খাবার সরবরাহ করেছে। একটি নতুন টিউবওয়েল বসানো ছাড়া সরকার এ পর্যন্ত আর কিছু করেনি।

যদিও বাংলাদেশের পটভূমিকায় টঙ্গী এতটা ভয়ঙ্কর নয় যতটা কেউ কেউ বলে থাকেন। তবুও মনস্তাত্ত্বিক এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য দিক দিয়েও এর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ঢাকার বস্তিজীবন কঠোর ছিল বটে কিন্তু অনেক বস্তিবাসীর চাকরি ছিল। টঙ্গী ক্যাম্পে শতকরা মাত্র ৫ জনের নিয়মিত রোজগারের ব্যবস্থা আছে, শতকরা ১৫ জন অনিয়মিতভাবে রিকশা, বেবী টেক্সী কিংবা ঠেলাগাড়ি চালায় আর বাদবাকী সবাই একদম বেকার।

অর্থ নেই বলে কর্মসংস্থানের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। কিছু সমালোচক বলেন যে, এ ধরনের ক্যাম্পে সমস্ত চাহিদার জন্য সরকারের প্রতি নির্ভরশীলতার উৎসাহ যোগায় মাত্র। আন্তর্জাতিক অর্থ সংকটে বিদেশী সাহায্য যখন অনিশ্চিত, তখন এ নির্ভরশীলতা অচিরেই জলাভূমিতে পরিণত হবে। টঙ্গী একেবারেই অরক্ষিত। বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, বৃষ্টি শুরু হলে টঙ্গী ৮ ফুট পানির নিচে ডুবে যাবে। আর তখনই টঙ্গী ক্যাম্পের বাসিন্দাদের সত্যিকার দুঃস্বপ্ন হবে।

www.pathagar.com

ভারতীয় আধিপত্যের কবলে বাংলাদেশ

জেকুইস লেসলী, লসএঞ্জেলেস টাইম

ভারত তার পণ্য বাজারের পশ্চাদভূমি হিসাবে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ সৃষ্টিতে 'মিত্র' শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। বাংলাদেশ সৃষ্টির পরই এ সত্য উপলব্ধি হয়েছিল সর্বমহলে। লসএঞ্জেলেস টাইম পত্রিকায় জেকুইস লেসলীও এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তার সরেজমিন সফর থেকে। ১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল তার অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয় ওই পত্রিকায়।

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বিপুল সহায়তায় স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির তিন বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের জনমত ভারতের প্রতি বিরূপ হয়ে গেছে।

ভারত ও বাংলাদেশের সরকারী কর্মচারীরা এখনো বলেন যে, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক খুবই আন্তরিক। কিন্তু বেসরকারী অধিকাংশ বাঙ্গালীর মনোভাবে তা প্রতিফলিত হয় না।

কোন নির্দিষ্ট অভিযোগের চেয়ে বরং ভারতের বিরুদ্ধে বহু বাঙ্গালীর অভিযোগ এই যে, এশিয়া মহাদেশে ভারত প্রাধান্য লাভ করেছে এবং শুধু আয়তনের বিশালত্ব দ্বারাই ভারত বাংলাদেশের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রিত না করলেও প্রভাবিত করতে সক্ষম।

এই কিছুদিন আগে একজন মাঝারি শ্রেণীর বাংলাদেশী সরকারী কর্মচারী জনৈক পাশ্চাত্যদেশীর কাছে সবিদ্রুপ কৌতুকের ছলে বলেছিলেন, "ভারত বলেছে, পৃথিবীর মধ্যে সেই হচ্ছে বৃহত্তম গণতন্ত্র। তাই যদি হয় তাহলে বাংলাদেশ অবশ্যই পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম গণতন্ত্র।"

বেশ কিছুসংখ্যক বাংলাদেশী এখন এই ধারণা পোষণ করেন যে, ১৯৭১ সালের যুদ্ধে– যে যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে–ভারতের প্রধান স্বার্থ ছিল পাকিস্তানকে ভেঙ্গে এই উপমহাদেশে স্বীয় প্রাধান্য নিশ্চিত করা।

'হলিডে পত্রিকার সম্পাদক এনায়েত উল্লাহ খান বলেছেন, "বাংলাদেশ মূলতঃ একদিকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও অপরদিকে বাঙ্গালীদের ইচ্ছার ফল।" ভারত সম্পর্কে বাঙ্গালীদের মোহ যে কেটে গেছে তা অধিকাংশ বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ সমস্যারই প্রতিফলন। কিছু বাংলাদেশী মনে করেছেন যে, বাংলাদেশের সৃষ্টির জন্য ভারত যেমন প্রধানতঃ দায়ী, তেমনি বাংলাদেশের বর্তমান দুর্দশার জন্যও ভারত দায়ী।

অত্যন্ত উত্তজনাপ্রবণ যে কয়টি সমস্যার সাথে বাংলাদেশ জড়িত আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে ভারত–সীমান্তের ১২ মাইল অভ্যন্তরে গঙ্গা নদীর ওপর ফারাক্কা বাঁধ। ডিসেম্বর মাসে যখন এই বাঁধ চালু করা হবে, তখন গঙ্গার পানি কলিকাতার পাশ দিয়ে

www.pathagar.com

বহমান হুগলি নদী দিয়ে প্রবাহিত হবে। গঙ্গার পানির এই ধারা পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হল কলিকাতা বন্দরকে তলানিমুক্ত করা– যে তলানির জন্য কলিকাতা বন্দর প্রায় অনাব্য হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশীরা ভয় করছে যে, এই পরিবর্তনের ফলে গঙ্গা নদীর নিম্নাংশ যা বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে–গ্রীষ্মের মৌসুমে একদম শুকিয়ে যাবে।

কিছুসংখ্যক বাংলাদেশী এ অভিযোগও করেন যে, ভারত সরকারই বাংলাদেশ থেকে পাট ও চাল পাচারে উৎসাহ যোগাচ্ছে।

ভারতীয় সরকারী কর্মচারীরা স্বীকার করছেন যে, বাংলাদেশের পাট ও চাল পাচার হচ্ছে। তবে, তারা অস্বীকার করেন যে, এতে ভারত সরকারের হাত আছে। তারা যুক্তিসংগতভাবেই বলেন যে, ১৫০০ মাইল দীর্ঘ বাংলাদেশ–ভারত সীমান্ত পাহারা দেয়া অসম্ভব। "পাচারে উৎসাহ দিচ্ছে বলে ভারত সরকারকে দোষারোপ করা মোটেও সঙ্গত নয়। সীমান্তের উভয় পাশের ব্যবসায়ীরাই পয়সা বানাবার চেষ্টায় আছে।" বললেন একজন ভারতীয়।

বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদেরই উৎসাহ রয়েছে সীমান্তের ওপারে কাঁচামাল পাচার করার। কেননা, সরকারীভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের মুদ্রার বিনিময় হার সমান হলেও কালোবাজারে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য বাংলাদেশী মুদ্রার দ্বিগুণ। ফলে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরা চাল ভারতে পাচার করে ভারতীয় টাকায় বিক্রি করে এবং সেই টাকা দিয়ে বাংলাদেশে যেসব জিনিসের অভাব, তা ভারত থেকে কিনে বাংলাদেশে এনে দ্বিগুণ দামে বিক্রি করে।

ভারতের একটা উদ্বেগের কারণ হচ্ছে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক। চীন হচ্ছে ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। যদিও আজ পর্যন্ত চীন ও বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি, চীন তার রেডক্রসের মাধ্যমে বাংলাদেশে বন্যা–রিলিফের জন্য এক মিলিয়ন ডলার সাহায্য পাঠিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

বহু বাংলাদেশীর বিশ্বাস, ভারত কখনো বাংলাদেশকে চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে দিবে না। এ প্রসঙ্গে জনৈক বাংলাদেশী সরকারী কর্মচারী বললেন, "ভারত চায় বাংলাদেশ জোট–নিরপেক্ষ থাকবে... এবং এমন বৈদেশিক সম্পর্ক গড়ে তুলবে না যা ভারতের স্বার্থ পক্ষে ক্ষতিকর।"

অন্যান্য পর্যবেক্ষকরা এর চেয়ে বেশি বলেন। "যদি বাংলাদেশের উপকূলে তেল পাওয়া যায় আর ভারতের অবস্থা যদি আরো খারাপ হয় তবে ভারত সরাসরি বাংলাদেশ উপকূল দখল করবে"। –ভবিষ্যদ্বাণী করলেন জনৈক বিদেশী অফিসার, "বাংলাদেশের ভাগ্য বাংলাদেশের হাতে নেই।"

www.pathagar.com

ভারতীয় গ্রাসের ভয়ে বাংলাদেশ

হিউস্টন পোস্ট

ভারতের সিকিম গ্রাস এবং বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ভারত প্রেমিকদের উল্লম্ফন। অতএব সবকিছু স্পষ্ট। এবার ভারত তার থাবা বিস্তার করবে বাংলাদেশে। '৭৪-এর ৩ নভেম্বর টেক্সাস থেকে প্রকাশিত হিউস্টন পোস্ট পত্রিকায় এ বিষয়ে প্রকাশিত বিস্তৃত বিশ্লেষণ।

এ বছর শরৎকালে হিমালয় পাদদেশের ক্ষুদ্র রাজ্য সিকিমের ওপর পক্ষ বিস্তার করে "ভারতমাতা" অজান্তেই বাংলাদেশে ভারত-বিরোধী মনোভাবকে প্রজ্বলিত করে দিয়েছে।

সিকিমের ঘটনার খবর বাংলাদেশের রাজধানীতে পৌছার সাথে সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এবং ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে ভারতীয় "সম্প্রসারণবাদের" বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে।

বাংলাদেশের অধ্যাপকরা এক প্রতিবাদলিপিতে লিখলেন, "সিকিমকে ভারতীয় অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার আইনকে আমরা সিকিমের সার্বভৌমত্বের ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ বলে মনে করি। এ ধরনের সম্প্রসারণ নীতি ভারতের প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর প্রতি এক মারাত্মক হুমকি"।

"বাঙ্গালীরা সিকিমকে কোন গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু তাদের ভয়, সিকিমের ভাগ্যে যা ঘটেছে বাংলাদেশের ভাগ্যেও মোটামুটি তাই রয়েছে"-বললেন জনৈক পশ্চিম দেশীয় কূটনীতিবিদ। অপর একজন বললেন, "১৯৭১ সালে যখন নয়াদিল্লী বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিল, তখন থেকেই বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে গেছে। সেদিন খুব দূরে নয়, যেদিন বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে ভারত মুখ 'হা' করে এগিয়ে আসবে এবং যখন মুখ বন্ধ করবে তখন বাংলাদেশ ভারতের পেটের ভিতর"।

ভারতের সিকিম গ্রাস প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের ভারতঘেঁষা সরকারেরও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। ভারতের সিকিম নীতির প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে জনৈক সরকারী কর্মচারী জবাব দিলেন, "ভারত বৃহৎ শক্তি. আমাদেরকে বেষ্টন করে আছে।"

ভারতের সংবাদপত্রের একটি কার্টুন বিশেষ দুশ্চিন্তাদায়ক ছিল। কার্টুনটিতে এ ধরনের টিপ্পনী চিত্রিত করা হয় যে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সিকিমকে ট্রামে চড়িয়ে ভারতীয় পার্লামেন্টের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন। অদূরে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের নেতৃবর্গ বাচ্চাদের ন্যাপকিন পরে দাঁড়িয়ে 'মাসীকে' পরের বার তাদেরকে ট্রামে তুলে নিতে অনুরোধ করেছেন।

www.pathagar.com

"আমরা এর ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ভারত সরকার জবাব দেননি"–অভিযোগ করেন জনৈক বাংলাদেশী অফিসার। তিনি বললেন, "আমরা সিকিমের চেয়ে বড় এবং আমরা জাতিসংঘের সদস্য। কাজেই তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই"।

কিন্তু বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত 'দৈনিক ইত্তেফাকের' ৩২ বছর বয়স্ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন বললেন, "সিকিমে যেমন করেছে, তেমনি বাংলাদেশেও ভারত অভ্যান্তরীণ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে এবং এই সমস্যার অজুহাতে সে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করতে পারে।"

বাংলাদেশ মুসলমান। ভারত প্রধানতঃ হিন্দু। কিন্তু ভারতের শ্বাসরুদ্ধকর অর্থনৈতিক চাপে বাংলাদেশে ভারত–বিরোধী মনোভাব তীব্র হচ্ছে। কেননা, বাংলাদেশে যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দারুণ অভাব।

বাংলাদেশে যখন লাখ লাখ লোক অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, তখন বিপুল পরিমাণ চাল বেআইনীভাবে সীমান্তের ওপারে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের হিসাব মতে, এ বছর ১০ লাখ টন চাল ভারতে পাচার হয়ে গেছে। এ পরিমাণ চাল বালাদেশের জনসাধারণকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন।

বহু বাংলাদেশী আফসোসের সঙ্গে স্মরণ করে যে, পাকিস্তানে থাকতে তাদের পাট ও চায়ের তৈরী বাজার ছিল এবং বিনিময়ে তারা (পশ্চিম পাকিস্তান থেকে) নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাল পেয়েছে।

আজ পাট বিক্রয়ের ব্যাপারে বিশ্বের বাজারে বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। অধিকন্তু, আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশকে আকাশচুম্বী খাদ্যশস্য কিনতে হচ্ছে।

www.pathagar.com

হানিমুন শেষ

ওয়াল্টার সোয়ার্জ, লন্ডন গার্ডিয়ান

বাংলাদেশকে শ্মশানে পরিণত করেও ভারতের খাই মেটেনি। আরো চাই। শূন্য বাংলাদেশ কি আর দেবে? তাই বাংলাদেশের প্রতি ভারতের প্রেম অপ্রেমে রূপ নিলো। না দিতে পারলেই যে এমন হয়, তা বুঝতে পেরেছেন লন্ডন গার্ডিয়ান পত্রিকার ওয়াল্টার সোয়ার্জ। ১৯৭৫ সালের ৩১ জানুয়ারি তিনি দিয়েছেন এই অপ্রেমের বর্ণনা।

বাংলাদেশ ভারতীয় অস্ত্র এবং কূটনীতির শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর। বাংলাদেশের মুক্তির কাহিনী প্রায় পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর মতই চলেছিল এবং কূটনীতির প্রতি ধাপ তদারক করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধী স্বয়ং। তিনি এমন সুকৌশল এবং সূক্ষ্মতার সাথে কাজটি পরিচালনা করেছিলেন যা নয়াদিল্লীর কূটনীতিতে সচরাচর দেখা যায় না।

নয়াদিল্লী বাংলাদেশের পক্ষ বরাবর সমর্থন করে আসছে। এমনকি তখনও যখন সমর্থন করার কোন যুক্তিই নেই। যেমন, বাটোয়ারার হিস্যা হিসাবে পাকিস্তানের কাছে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাওনার দাবিকে নয়াদিল্লী সমর্থন করেছে।

শেখ মুজিবের পক্ষে যখন আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ল নয়াদিল্লী তখন নীরবে তার জন্য বেসামরিক রক্ষীবাহিনী গঠন করে ট্রেনিং দিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে দিয়েছে।

'নাইট' কর্তৃক উদ্ধারকৃত তরুণীর মত বাংলাদেশ কোন অন্যায় করতে পারে না। এতদিন ভারতীয় সংবাদপত্রে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটি উচ্চারিত হয়নি। কিন্তু চার বছর কেটে গেছে, হানিমুন শেষ হয়ে গেছে এবং তরুণীর রূপ কমে গেছে।

শেখ মুজিবকে দুর্বৃত্ত চিহ্নিত করে বাংলাদেশের অনাহার ও অব্যবস্থার ওপর একটি বিদেশী পত্রিকার রিপোর্ট সম্প্রতি 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। দুর্নীতি দমনে শেখ মুজিবের উটপাখী সুলভ ব্যর্থতার সমালোচনা আজকাল কার্টুন ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধে অভিব্যক্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশে ভারতবিরোধী জনমত শুরু থেকেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কিছুকাল আগেও তা জনসাধারণের অন্ধ অসন্তোষের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না, যে জনসাধারণ পাকিস্তানী জিনিসের বহুগুণ চড়া দামে প্রতিটি জিনিস কিনতে বাধ্য হয়েছে।

ভারত বলতে পারে যে, মুদ্রাস্ফীতি ভারতের দোষে হয়নি। সে আরও বলতে পারে যে, যদি উৎপাদিত চাল ও পাটের এক-ষষ্ঠাংশ ভারতে পাচার হয় তাহলে তা বন্ধ করার দায়িত্ব বাংলাদেশের।

www.pathagar.com

কিন্তু হালে বাংলাদেশ যখন অর্থনৈতিক সংকট ও সম্ভাব্য রাজনৈতিক অচলাবস্থার মখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে ভারতে যে মনোভাব প্রকাশ পেতে শুরু করেছে তা মোটেই বন্ধুসুলভ নয়। চাল ও পাট পাচার বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর, কিন্তু ভারতের জন্য তা মঙ্গলদায়ক। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় চালের দারুণ অভাব। ভারতের পাটশিল্প বাংলাদেশের পাটের ওপর একান্ত নির্ভরশীল।

বর্তমানে বঙ্গোপসাগরের আন্তর্জাতিক সীমারেখার অপেক্ষাকৃত এক নতুন বিবাদ দানা বেঁধে উঠেছে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে নয়, দুই সরকারের মধ্যে। সমস্যাটা মোটেই 'একাডেমিক' নয়। কেননা উপকূলীয় তেল আহরণের জন্য জোর অনুসন্ধান চলছে।

আরো সর্বনাশা হচ্ছে গঙ্গার পানি নিয়ে বিতর্ক। ফারাক্কায় ভারতের বিরাট বাঁধ অচিরেই বেশির ভাগ পানি বাংলাদেশের কৃষকদের কাছ থেকে কেড়ে নেবে। আলাপ–আলোচনা অচলাবস্থায় এসে ঠেকেছে। এখন শেখ মুজিব ও মিসেস গান্ধীর মধ্যে চূড়ান্ত বৈঠকের অপেক্ষা। দিনক্ষণ এখনো ধার্য হয়নি।

সবচেয়ে দুর্ভাবনা হচ্ছে, বাংলাদেশের কাঠামো ধসে পড়ে কী হবে? কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভারতীয় সেনাবাহিনী ঢুকে পড়তে পারবে। কিন্তু তাহলে মুক্তিযুদ্ধ কেন হয়েছিল? ইতিমধ্যে মিঃ জুলফিকার আলী ভুট্টো উর্দু বক্তৃতায় বেশ রসাল স্বগতোক্তি করেছেন, 'মনে হচ্ছে কোনো কোনো দেশ তাদের স্বাধীনতা তেমন উপভোগ করছে না।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধসে যদি নাও পড়ে, একটানা অধঃপতনের ফলে বাংলাদেশ একটি বিপজ্জনক 'পাওয়ার ভ্যাকুয়াম'-এ পরিণত হতে পারে। কিউবিক ফুট প্রাকৃতিক গ্যাস আছে।' এই হচ্ছে আমেরিকানদের ধারণার প্রতিবাদে মুজিবের জবাব। আমেরিকানরা ধরে নিয়েছে যে, বাংলাদেশে মূলধন নেই, সম্পদ নেই, ভবিষ্যৎও নেই। এ ধারণা মুজিব পরিবেশিত তথ্যের ও তার 'মর্যাদার' পক্ষে অপমানকর।

আপনারা জানেন, রকফেলারের সবকিছুই আছে, কিন্তু তিনি তা নিজে মুখে জাহির করার কথা কখনো ভাবেন না।

মুজিবের লক্ষ্যবস্তু অত্যন্ত জরুরি: 'আমার দেড় হাজার লঙ্গরখানা আছে। আমার লোকদের বাঁচানোর জন্য চাই মোট চার হাজার তিন শতটি (শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি ইউনিটে একটি করে) নিজের পেটে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন মুজিব।

যুক্তরাষ্ট্রকে দেবার মত বাংলাদেশের কিছুই নেই। এ সত্য সম্বন্ধে সচেতন মুজিব–তাই দু'দেশের মধ্যে ব্যবধান দূর করার জন্য আমেরিকানদের অনুকম্পা ও মানবিক দায়িত্বরোধের ওপর ভরসা করছেন।

এই পর্যায়ে জন, ডি রকফেলার কথা বলার সুযোগ পেলেন। বললেন, 'দু'দেশের মধ্যে হাজার ব্যবধান সত্ত্বেও আমেরিকান ও বাঙ্গালীরা একই স্বাধীন বিশ্বের অংশ।'

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ফুল সার্কেল

বোল্ড আমেরিকান

সূচনা থেকে মাত্র তিন বছরের মধ্যে একটি দেশের স্বাধীনতা কি ভয়াবহ নৈরাজ্যে নিপতিত হতে পারে উচ্চাভিলাষী ব্যর্থ নেতৃত্বের বদৌলতে তা হিসাব কষে দেখিয়েছে বোস্টন থেকে প্রকাশিত বোল্ড আমেরিকান পত্রিকা। ১৯৭৫ সালের ৩০ জানুয়ারি 'বাংলাদেশ ফুল সার্কেল' শিরোনামে এই নৈরাজ্যের বিশদ বিবরণ উঠে আসে।

তিন বছর আগে গত মাসে (ডিসেম্বর) একটি নতুন জাতির জন্ম হয়। পাকিস্তানের পূর্বাংশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ ভারত ও রাশিয়ার সাহায্যে আমেরিকার সাহায্যে নয়– তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী হয়েছিল তখন আমেরিকা পাকিস্তানের দিকে 'ঝুঁকে পড়েছিল' বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।

সেদিন বাংলাদেশের জন্মোৎসব দুনিয়া জুড়ে প্রতিপালিত হয়েছিল অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুক্তির বিজয় হিসাবে, আর বাঙ্গালী 'মুক্তিযোদ্ধা' ও 'মুক্তিদাতা', যিনি কিছুকালের জন্য আমেরিকান ক্যানভাসে জেন ফন্ডা ও ড্যানিয়েল এলসবুর্গের মত হিরো সেজে বসেছিলেন, সেই শেখ মুজিবুর রহমানের অনুসারীদের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধির এক নবযুগের সূচনারূপে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ গত তিন বছর বাংলাদেশ ও শেখ মুজিবের জন্য ভাল যায়নি। স্বাধীনতার আগে ছিল অভাব-অনটন; এখন চলছে ব্যাপক অনাহার। দেশে যে কয়টি শিল্প-কারখানা আছে, নতুন সরকার তা রাষ্ট্রায়ত্ত করেছেন। এগুলোর উৎপাদন আশংকাজনকভাবে কমে গেছে। দুর্নীতি আর অপরাধ চলছে চরম আকারে। প্রধান খাদ্যশস্য চালের দাম চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ৩৬ মাসে কমপক্ষেও ৩ হাজার রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।

এসব সমস্যার দু'একটির মোকাবিলা করার জন্য মাত্র ৩ বছরের পুরান শাসনতন্ত্র মুলতবি রেখে, হেবিয়াস কর্পাসের অধিকার বিলুপ্ত করে, বিনা বিচারে আটক রাখার অনুমতি দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান গত মাসে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন।

এই সেদিন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের শেষ ধ্বংসাবশেষটুকু ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। বিনা ওজরে, বিনা বিতর্কে পার্লামেন্টে শেখ মুজিবকে একচ্ছত্র ক্ষমতা দিয়ে এক নতুন ধরনের সরকার সৃষ্টি করা হয়েছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, তিন বছর যেতে না যেতেই বাংলাদেশের 'মুক্তিদাতা' শেখ মুজিব দেশের ডিক্টেটর হয়ে বসে আছেন। আরো পরিহাস এই যে, যে পাকিস্তানের উৎপীড়ন থেকে তিনি তার দেশবাসীকে মুক্ত করেছিলেন, সেই পাকিস্তান আজ অধিকতর মুক্ত এবং সমৃদ্ধ।

www.pathagar.com

গত সোমবার 'দি নিউইয়র্ক টাইমস' প্রকাশ করেছে যে, তিন বছর আগে পরাজয় ও অবমাননা ভোগ সত্ত্বেও পাকিস্তান আজ অপ্রত্যাশিতভাবে এশিয়া মহাদেশে অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে সজীব দেশ হিসাবে দেখা দিয়েছে।

যদিও এখনো গরীব দেশ কিন্তু পাকিস্তানে অনাহারে লোক মরছে না। তাদের জীবনযাত্রার মান বেড়ে চলেছে এবং 'দি টাইমস' পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের সরকার 'ধ্বংসাবশেষ কাটিয়ে উঠে সম্মুখে এগিয়ে যেত সক্ষম হয়েছে।'

পেছনের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আদর্শবাদীরা যখন বাংলাদেশের মুক্তির জন্য চিৎকার করছিল, তখন আমেরিকার উচিত ছিল, পাকিস্তানকে আরো সবল সমর্থন দেয়া।

www.pathagar.com

অনাহার সমস্যার অংশমাত্র

জন ডি গ্রেইটস, ইভেনিং জার্নাল

'মিত্র শক্তি ভারতের কৃপায়' স্বাধীন বাংলাদেশ শুধুমাত্র অনাহার নিয়ে জন্মায়নি। আসলে বাংলাদেশের পায়ে রয়েছে ভারতের পরানো শেকল। ডেলাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বয়ারের এই পরোক্ষ মতামত ১৯৭৫-এর ১৩মে প্রকাশিত হয়েছে ইভেনিং জার্নাল পত্রিকায়। বয়ারের বর্ণনা উঠে এসেছে জন ডি গ্রেইটসের কলামে।

ডেলাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশনের মেসিক প্রফেসর উইলিয়াম ডব্লিউ বয়ার বলেন, বহুল প্রচারিত খাদ্যাভাব ও রাজনৈতিক সংগ্রাম বাংলাদেশের সমস্যার অংশমাত্র। এশিয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট এডমিনিস্ট্রেশন সম্পর্কে জ্ঞানান্বেষণে এক মাস কাটিয়ে প্রফেসর বয়ার সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছেন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বয়ার বলেন, বাংলাদেশে মানবিক প্রচেষ্টার কোনো ক্ষেত্রই অসুবিধামুক্ত নয়। কল্পনা করুন যে, উইনকনসিন স্টেট অতিক্রম করতে এক মাস কি তারও বেশি সময় লাগছে। তাহলে বাংলাদেশের পরিবহন সমস্যা উপলব্ধি করতে পারবেন। কোনো কোনো সময় একটা ট্রাক চাটগাঁ বন্দর থেকে রাজধানী ঢাকায় এসে পৌঁছতে কয়েক মাস লেগে যায়। যদিও গোটা দেশটা আয়তনে প্রায় উইনকনসিনের সমান। বয়ার বলেন, ক্ষুদ্র মন্থর গতিবেগসম্পন্ন খেয়া নৌকায় বড় বড় নদী পার হওয়াটাই এখানকার প্রধান সমস্যা। হয়ত ৫০টি ট্রাক সারিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে নদী পার হতে কিন্তু খেয়া নৌকা এক দফায় মাত্র দুটো ট্রাক নিতে পারে। 'নদী পার হতে কয়েকদিন লেগে যেতে পারে,' বয়ার যোগ দিয়ে বললেন।

রাজনৈতিক দুর্নীতি দেশটির প্রগতিকে ব্যাহত করছে। ডকে সিমেন্ট স্তূপীকৃত হয়ে আছে এবং বৃষ্টিতে ভিজে জমাট বেঁধে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মুষ্টিমেয় লোকের লাভের জন্য আমদানিকৃত খাদ্যশস্য দেশের বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে, আর লাখ লাখ লোক মরছে অনাহারে। শিল্প-কলকারখানায় উৎপাদন হতাশাব্যঞ্জক। অনাহারই হচ্ছে পয়লা নম্বর সমস্যা। পার্লামেন্টের একজন সদস্য বয়ারকে বলেন যে, তার জেলায় শতকরা ২৫ জন লোক অনাহারের পর্যায়ে আছে। বাংলাদেশের মাপকাঠিতে এর অর্থ এই যে, আজ একবেলা খাওয়া, তাও অর্ধাহার, কাল উপোস, পরের দিন আবার এক বেলা এবং অর্ধাহার।

প্রশাসনিক ব্যাপারেও বাংলাদেশ পিছিয়ে গেছে। বয়ার বলেন, কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ওষুধপত্র বোঝাই একটি মালগাড়ি ঢাকা স্টেশনে পড়েছিল। যে কর্মচারীটি

www.pathagar.com

চার্জে ছিলেন বললেন, গাড়ির তালা খুলে ওষুধ বের করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের প্রয়োজন। জনৈক, আমেরিকান 'এইড অফিসার' নিরাশ হয়ে কয়েকজন শ্রমিককে পয়সা দিয়ে তালা ভেঙ্গে ক্ষুদে বাঙ্গালী কর্মচারীকে দেখিয়ে দিলেন যে, ওপরওয়ালার অনুমোদন আর দরকার নেই। গত জানুয়ারি মাসের চেয়ে এখন অবস্থার হয়ত যৎসামান্য উন্নতি হয়েছে, কিন্তু ১৯৭১ সালের আগেকার দিনগুলোর মত হয়নি। তখন বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ ছিল। বয়ারের মতে, প্রায় সকলেই একমত যে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাঙ্গালীরা তখন অধিকতর ভাল ছিল। বাংলাদেশ সফরটি 'কোনোরকমেই আনন্দদায়ক ছিল না। তেমন কিছু করার মতও ছিল না। শুধু বই পড়েছি... অনেক বই,' বললেন বয়ার।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে এত যে সাহায্য পাচ্ছে। ১৯৭২ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সাহায্য পেয়েছে এবং এর মধ্যে আমেরিকা দিয়েছে ৫০০ মিলিয়নের ওপর তার কারণ বাংলাদেশের শোচনীয় অবস্থা দুনিয়ার সর্বত্র সহানুভূতির উদ্রেক করে। বয়ার বললেন, তিনি বাংলাদেশে থাকতে জনৈক সরকারি কর্মচারী বলেছেন যে, কোনো দিক দিয়েই বাংলাদেশের গুরুত্ব নেই। তিনি আরো বললেন যে, 'মজার ব্যাপার এই যে, বিদেশী কাউকে জিজ্ঞেস করুন, এ দেশে কেন এসেছেন? জবাবে কেউ সহানুভূতির কথা বললেন না। মানুষ সহানুভূতির কথা স্বীকার করতে পছন্দ করে না।'

www.pathagar.com

গণতন্ত্রের মৃত্যু

ডেভিড হার্স্ট, ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ

দুর্ভিক্ষের লাখো বণি আদমের মৃত্যুতে শেখ মুজিবের তখতে তাউস যখন টলটলায়মান তখন শেষ রক্ষার জন্য তিনি ছুরি ধরলেন গণতন্ত্রের বুকে। জারি করলেন জরুরি অবস্থা। গণতন্ত্র হত্যার এই আয়োজন নিয়ে ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ পত্রিকায় '৭৫-এর ১০ জানুয়ারি বিশ্লেষণী মন্তব্য লেখেন ডেভিড হার্স্ট।

গত ২৮শে ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ উল্লাহকে সারাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার অনুমতি দিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান অবশেষে গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে এই সিদ্ধান্ত আকস্মিক নয়। এখানকার রাজনৈতিক মহল মাসাধিককাল যাবৎ এমনি সম্ভাবনার কথা আলোচনা করে এসেছেন। কেননা, গুজব রটেছিল যে, শেখ মুজিবুর রহমান পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা বাতিল করে প্রেসিডেন্সিয়াল প্রথা চালু করার ও নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করার চেষ্টা করছেন।

জরুরি অবস্থা বলবৎ করতে গিয়ে শেখ মুজিব সেই পুরনো জুজুর ভয়ই দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশে 'প্রো-পাকিস্তানীরা' এখনও সক্রিয়, কিন্তু অধিকাংশ পর্যবেক্ষক একমত যে, যেহেতু আওয়ামী লীগ সরকার যে সরকার ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে বাংলাদেশের জন্ম থেকে শাসন করে আসছে– ব্যর্থ হয়েছে– সে জন্যই জরুরি অবস্থা চালু করা হয়েছে। সরকার যে ওয়াদা পালনে ব্যর্থ হয়েছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখা যায় গ্রাম-বাংলায় যেখানে দুর্ভিক্ষ ও পুষ্টিহীনতায় হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করছে, আর যারা বেঁচে আছে তারা সরকারের গুণ্ডাবাহিনীর ভয়ে সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত।

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানী জেল থেকে ফিরে এসে তার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতায় শেখ মুজিব দেশবাসীর কাছে তিন বছরের সময় চেয়েছিলেন– যে সময় তিনি তাদের কিছু দিতে পারবেন না এবং হয়ত তাদের 'অনাহারে-অর্ধাহারে' থাকতে হবে। এক লাখ লোক– যারা নেতার বক্তৃতা শোনার জন্য সমবেত হয়েছিল জয় বাংলা, জয় মুজিব ধ্বনিতে তাকে অভিনন্দিত করেছিল।

কিন্তু শুভানুভূতির উল্লাস বছর যেতে না যেতেই উবে গেল। শেখ মুজিবের প্রতিশ্রুতি সোনার বাংলা সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ দেখা দিল, তারা জানতে চাইল, ক্ষুধা, অনাহার, জরা, পুষ্টিহীনতা এবং রক্ষীবাহিনী (নিরাপত্তা বাহিনী) নামে পরিচিত বাছাই করা প্যারা-মিলিটারী দলের নির্মম দৌরাত্ম্যের জন্যই স্বাধীনতা সংগ্রামে ৩০ লাখ বাঙ্গালী প্রাণ দিয়েছিল কিনা।

গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে গ্রাম-বাংলায় দৈনিক গড়ে ৭টি রাজনৈতিক খুন

www.pathagar.com

হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই খুনের শিকার হয়েছে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতারা অথবা তাদের সমর্থকরা। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আওয়ামী লীগের অনুচররা এবং সরকারি এজেন্সীগুলো গ্রাম-বাংলায় সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে জনসাধারণকে সরকারের কাছ থেকে আরো বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

সরকার কি কার্যক্রম গ্রহণের কথা ভাবছেন তা জরুরি ঘোষণায় স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে জরুরি আইনের ন্যস্ত 'স্পেশিয়াল' ক্ষমতার বলে শেখ মুজিব স্বয়ং কিংবা তার দল যাকেই 'বিপজ্জনক' মনে করবেন তাকেই জেলে পুরতে পারবেন, আর এভাবে বাংলাদেশে আজও যেটুকু সরকার বিরোধিতা টিকে আছে তা সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হবে।

গত অক্টোবর মাসে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং ঢাকা-দিল্লী-মস্কো চক্রের জোরালো সমর্থক তাজউদ্দীনের (অর্থমন্ত্রী) অপসারণ থেকেই বুঝা যাচ্ছিল যে, শাসক আওয়ামী লীগ গোষ্ঠীর ভিতর সত্যি গোলযোগ দেখা দিয়েছে। তাজউদ্দীনের পদচ্যুতির পর বেশ কিছুদিন সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রেস বাংলাদেশের বর্তমান বিপর্যয়ের জন্য তাকে দূরাত্মারূপে চিত্রিত করে অভিযান চালিয়েছিল। খাদ্যশস্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি থেকে রাজনৈতিক অসন্তোষ ও আইন-শৃংখলার ক্ষেত্রে অরাজকতা সবকিছুর জন্যই তাকে দোষী করা হল।

অবশ্য শেখ মুজিব জানতেন যে, তাজউদ্দীনের মত 'বিপজ্জনক' শক্তিকে উপেক্ষা করা যায় না, বিশেষতঃ যখন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের ভিতরে শেখ মুজিবকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ধীরে ধীরে একটি শক্তিশালী ও কার্যকরী দল গড়ে তুলছিলেন, সম্ভবতঃ এ কারণেই বাংলাদেশের নেতা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে প্রোৎসাহিত হয়েছেন।

শেখ মুজিবের সামনে দু'টি পথ খোলা আছে– হয় সর্বদলীয় সরকার গঠন করা (যেমন তাজউদ্দীন প্রস্তাব করেছিলেন) অথবা রক্ষীবাহিনী ও তার প্রতি অনুগত সেনাবাহিনীর সাহায্যে দেশ শাসন করা। কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রতি শেখ মুজিবের সহজাত বিরূপ ভাব রয়েছে, কেননা পাকিস্তানী আমলে তাদের হাতে তিনি অশেষ দুর্ভোগে ভুগেছেন।

কাজেই মনে হয় শেখ মুজিব প্রো-মস্কো ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও প্রো-মস্কো বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের নিয়ে সর্বদলীয় সরকার গঠনের পথ বেছে নেবেন। তার ও তার পার্টির দোষের জন্য হোক কিংবা তাদের আয়ত্তাতীত বলেই হোক, স্বাধীন বাংলাদেশে ব্যর্থতার জন্য শেখ মুজিবকেই তীব্র সমালোচনা করা হয়। দেখা যাক, বিলম্বে হলেও জরুরি অবস্থার মাধ্যমে তার কাজে দেশে গণতন্ত্র হারানোর ক্ষতিপূরণ হয় কি না।

www.pathagar.com

মুজিব একনায়কত্ব কায়েম করেছেন

পিটার গীল, ডেইলী টেলিগ্রাফ

প্রভুর সুতার টানে পুতুল রাজা শেখ মুজিব বেসামাল হয়ে পড়লেন গদি রক্ষায়। তিনি বাকশাল গঠনের মাধ্যমে একনায়কত্ব কায়েম করেছিলেন যে প্রেক্ষাপটে তার বিশদ বিবরণ উঠে এসেছে লন্ডন থেকে প্রকাশিত ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকায় পিটার গীলের কলামে '৭৫-এর ২৭ জানুয়ারি তারিখে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তার দেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু লাথি মেরে ফেলে দিয়েছেন।

গত শনিবার ঢাকায় পার্লামেন্টের একঘণ্টা স্থায়ী অধিবেশনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছে এবং একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে ক্ষমতা অর্পণ করেছে।

অনেকটা নিঃশব্দে গণতন্ত্রের কবর দেয়া হয়েছে। বিরোধী দল দাবি করেছিল, এ ধরনের ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ব্যাপারে আলোচনার জন্য তিনদিন সময় দেয়া উচিত। জবাবে সরকার এক প্রস্তাব পাস করলেন যে, এ ব্যাপারে কোনো বিতর্ক চলবে না।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয় মাস গৃহযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত কিন্তু গর্বিত স্বাধীন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব এমপিদের বললেন যে, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ছিল 'ঔপনিবেশিক শাসনের অবদান' (বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র রচনায়ও বৃটিশ বিশেষজ্ঞরা সাহায্য করেছিলেন)। তিনি দেশের স্বাধীন আদালতকে 'ঔপনিবেশিক' ও 'দ্রুত বিচার ব্যাহতকারী' বলে অভিযুক্ত করেন।

প্রেসিডেন্ট এখন খেয়াল-খুশী মত বিচারকগণকে বরখাস্ত করতে পারবেন, নাগরিক অধিকার-বিন্দুমাত্রও যদি প্রয়োগ করা হয়– তা প্রয়োগ করবে নতুন 'পার্লামেন্ট' কর্তৃক নিযুক্ত স্পেশাল আদালত।

এক্সিকিউটিভ অর্ডারের মাধ্যমে একটি 'জাতীয় পার্টি' প্রতিষ্ঠার জন্যে নতুন শাসনতন্ত্র মুজিবকে ক্ষমতা দিয়েছে। এটাই হবে দেশের একমাত্র বৈধ পার্টি। যদি কোনো এমপি যোগদান করতে নারাজ হন অথবা এর বিরুদ্ধে ভোট দেন তাহলে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।

এহেন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ঢাকায় সমালোচনা বোধগম্য কারণেই চাপা রয়েছে। কিন্তু ৩১৫ সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেন্টের ৮ জন বিরোধী দলীয় সদস্যের ৫ জনই প্রতিবাদে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগের ১১ জন সদস্য ভোট দিতে আসেননি। তাদের মধ্যে ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ গেরিলাবাহিনীর নায়ক

www.pathagar.com

ও প্রাক্তন মন্ত্রী জেনারেল এমএজি ওসমানী। শোনা যায় তিনি আওয়ামী লীগ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

শেখ মুজিব ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে শাসন করতে পারবেন। নতুন শাসনতন্ত্র ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত জাতীয় পার্লামেন্টের মেয়াদও দু'বছর অর্থাৎ ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে, তবে পার্লামেন্ট বছরে মাত্র দু'বার অল্পসময়ের জন্য বসবে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও কাউন্সিল অব মিনিস্টারস-এর মাধ্যমে সরকার পরিচালিত হবে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন।

বাংলাদেশের ঘনায়মান আর্থিক ও সামাজিক সংকটে বিদেশী পর্যবেক্ষকগণ সন্দেহ করছেন যে, দেশে একনায়কত্বের প্রয়োজন আছে কিংবা শেখ মুজিবের উদারতা আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশ যে নিশ্চিত দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে শেখ মুজিবের নতুন ক্ষমতা ও নতুন ম্যান্ডেট তাতে তেমন কোনো তারতম্য ঘটাতে পারবে কিনা।

এক মাস আগে শেখ মুজিব জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বামপন্থী গেরিলা নেতা সিরাজ সিকদারকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে, জরুরি আইন প্রয়োগে বিন্দুমাত্র সুশাসন– বর্তমানে সুশাসন বলতে কিছু নেই পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভব কিনা।

নতুন প্রেসিডেন্টের যে আদৌ প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই- তা গত তিন বছরে যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। তার স্টাইল হচ্ছে ডিক্টেটরের স্টাইল। তিনি গুটিকতক নিম্নতম অফিসারের প্রমোশনে ও তাদের অভিমতে যথেষ্ট আগ্রহ দেখান এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রায়ই ফেলে রাখেন।

একদলীয় শাসন সৃষ্টি ফলে দুর্নীতি দূর না হয়ে বরং বাড়তে থাকবে। কেননা, উদ্ধত আওয়ামী লীগারদের 'চেক' করতে পারবেন একমাত্র প্রেসিডেন্ট। তিনি থাকবেন অতিরিক্ত কাজের চাপে। সরকার বিরোধীরা যতই আত্মগোপন করতে বাধ্য হবে ততই গ্রাম-বাংলায় চরমপন্থী গেরিলা ও লুটতরাজকারীদের সমর্থন বাড়তে থাকবে।

www.pathagar.com

অহমিকার খোরাক চাই

এন্টারপ্রাইজ, রিভারসাইড

'৭৫-এর ২৯ জানুয়ারি। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে প্রকাশিত রিভারসাইড পত্রিকায় এন্টারপ্রাইজ লিখেছেন বাকশাল গঠনের মাধ্যমে শেখ মুজিবের একচ্ছত্র ক্ষমতা দখলের বিষয়ে। 'এক নেতা এক দেশ'-এর ধারণায় এই ক্ষমতা দখল ছিল মুজিবের অহমিকার আরো খোরাক জোগানোর একটা প্রয়াস মাত্র।

গত সপ্তাহে ঢাকায় পার্লামেন্ট নিজের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত করে দিয়েছে এবং 'জাতির পিতা' শেখ মুজিবুর রহমান একচ্ছত্র ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। সাধারণ পার্লামেন্টারী কাঠামোর কোনোকিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না।

শেখ ঘোষণা করলেন, বাংলাদেশের দুশমন, পাচারকারী ও কালোবাজারীরা বিদেশী এজেন্টদের সহযোগিতায় দেশে 'অব্যবস্থা' সৃষ্টি করেছে। অতএব একচ্ছত্র ক্ষমতা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল।

প্রধানমন্ত্রী ও ৩১৫ সদস্যের পার্লামেন্টে ৩০৮ সদস্যবিশিষ্ট দলের নেতা হিসেবে শেখের আগেই বিপুল ক্ষমতা ছিল। এই মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে না, বর্ধিত ক্ষমতা নিয়ে তিনি এমন কি করতে পারবেন। সম্ভবতঃ যেসব সমালোচনা তিনি বরদাশত করতে পারবেন না, অথচ আগে বন্ধও করতে পারেননি, এখন তা বন্ধ করতে পারবেন।

কিছুকাল আগে মেক্সিকোর 'একসেলসিয়র' পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে তাকে যখন প্রশ্ন করা হল, খাদ্যশস্যের অভাবের ফলে দেশে মৃত্যুর হার ভয়াবহ হতে পারে কিনা, শেখ জবাব দিলেন, 'এমন কোনো আশংকাই নেই। প্রশ্ন করা হল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পার্লামেন্টে বিরোধী দল বলেন যে, ইতিমধ্যেই ১৫০০০ লোক মারা গেছে। তিনি জবাব দিলেন, 'তারা মিথ্যা বলেন।' কথা হল, ঢাকার বিদেশী মহল মৃত্যু সংখ্যা আরো বেশি বলে উল্লেখ করেন। শেখ জবাব দিলেন, তারা মিথ্যা বলেন।' প্রশ্ন করা হল, দুর্নীতির কথা কি সত্য নয়?' 'ভুখাদের জন্য প্রেরিত খাদ্য কি কালোবাজারে বিক্রি হয় না...?' শেখ বলেন 'না। এর কোনটাই সত্যি নয়।'

যেসব সমস্যা তার দেশকে বিপর্যস্ত করছে সেসবের কোনো জবাব না থাকায় শেখের একমাত্র জবাব হচ্ছে তার নিজের একচ্ছত্র ক্ষমতা বৃদ্ধি। জনসাধারণের জন্য খাদ্য না হোক, তার অহমিকার খোরাক চাই।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট মুজিব

ফ্রন্টিয়ার

গণতন্ত্রী(?) মুজিবের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে বাকশাল গঠন এবং প্রধানমন্ত্রী থেকে শেখ মুজিবের প্রেসিডেন্ট হওয়ার ভেতর দিয়ে। গণতন্ত্রের জায়গায় মুজিব যে, ডাণ্ডাতন্ত্র শুরু করেছেন, তা দেখেছে কলিকাতার ফ্রন্টিয়ার পত্রিকা। '৭৫-এর ১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় তারই বর্ণনা।

বাংলাদেশের অবস্থা যেমন আছে এবং মুজিব নিজে যেমন আছেন তাতে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জনসাধারণের কোনো উপকার হবে না। রাতারাতি মুজিব পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ছুঁড়ে ফেলে প্রেসিডেন্ট হিসাবে সমস্ত কার্যকরী ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। আমরা প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার বলতে যা বুঝি, এটা ঠিক তা নয়। মুজিব যে সর্বাত্মক ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন তা মার্কিন প্রেসিডেন্টেরও নেই। তিনি নিজের মর্জিমত একটি মাত্র রাজনৈতিক দলকে জাতীয় পার্টি হিসেবে কাজ করার অনুমতি দিতে পারবেন। তিনিই এই পার্টির কর্মসূচি, সদস্যপদ এবং সংগঠন নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং শুধুমাত্র এই পার্টির সদস্যরাই পার্লামেন্টের সদস্য হতে পারবে। বাংলাদেশের সুপ্রীমকোর্টের মৌলিক মানবাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা আর থাকবে না। এসব অধিকার– যদি কিছু আদৌ থেকে থাকে– প্রয়োগ করবে পার্লামেন্ট অর্থাৎ মুজিবের লোকদের নিযুক্ত স্পেশাল কোর্ট, ট্রাইব্যুনাল অথবা কমিশন। মুজিব দুর্ব্যবহার ও অযোগ্যতার অজুহাতে বিচারপতিগণকে অপসারিত করতে পারবেন। মিসেসজি (মিসেস গান্ধী)-এর মত তিনিও তার অনুগত বিচারপতি দেখতে চান কিন্তু ক্ষমতার ঔদ্ধত্যে অথবা মানবিক উৎকর্ষতার অভাবে ডাণ্ডা প্রয়োগই তিনি বেশি পছন্দ করেন।

এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, সরকারের একচ্ছত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেই দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করা যায় না। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের দুঃখ-কষ্ট এবং নব্যশাসক শ্রেণীর সৃষ্ট শ্রেণীগত অসঙ্গতিরই ফল। কিন্তু বাংলাদেশের শাসক ও প্রশাসকরা অধিকতর অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ এবং লোভী– এরা রাতারাতি বড় হতে চায়। ধুরন্ধর ব্যক্তিরা উচ্চাশার টোপ ফেলেছিল যে, 'স্বাধীন' বাংলাদেশ প্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে এবং সরল মানুষেরা তা বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু ভারতীয় হস্তক্ষেপের ফলে যারা বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসীন হল তাদের মত স্বার্থপর নেতৃত্ব কোনো দেশে সত্যিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পর আর দেখা যায়নি। দেশটি যে অর্থনৈতিক ধসের দিকে এগিয়ে যাবে তা অবশ্যম্ভাবী ছিল। বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সাহায্য-সহায়তা বাংলাদেশের কোনো কাজে আসেনি। আরামদায়ক বন্দীদশা থেকে শেখ মুজিব প্রত্যাবর্তনের পর দেশের অবস্থা মন্দ থেকে

www.pathagar.com

মন্দতর হয়েছে; হাজার হাজার লোক বন্যা, দুর্ভিক্ষ আর বিকৃত গৃহযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। যারা আইউব আমলে পাঞ্জাবীদের কাছে তাদের ট্রেড ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স বিক্রি করে নিশ্চিত মুনাফা কুড়িয়েছিল, তারা এখনো ভাল মুনাফা কুড়াচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতি সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

জাঁকজমকের বিভ্রান্তিতে মুজিব যা করছেন তাতে তার নিজের এবং তার দলের ছাড়া আর কারো উপকার হবে না। হতে পারে, আজও গ্রাম বাংলার কিছু সরলপ্রাণ লোক তাকে জাতির পিতা হিসেবে দেখে আর মনে করে যে, একজন ভাল লোক রেকেটিয়ারদের হাতে পড়ে গেছে। মুজিব সরল লোকদের এই আবেগের ওপর নির্ভর করছেন। কিন্তু তার এ মর্যাদা স্থায়ী হবে বলে মনে হয় না।

জাতির প্রতি যা সবচেয়ে অবমাননাকর, মুজিব তাকে 'দ্বিতীয় বিপ্লব' নামে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ জানেন, প্রথম বিপ্লবের জন্য– যা বিদেশী চক্রান্তে হয়েছিল– জনগণকে কত খেসারত দিতে হচ্ছে। আমাদের ঐকান্তিক কামনা, বাংলাদেশের জনগণ দ্বিতীয় বিপ্লব কাটিয়ে উঠবে।

www.pathagar.com

শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন

কুলদীপ নায়ারে, স্টেটসম্যান উইকলী

বাকশাল মানেই জিঞ্জির। আর এ জিঞ্জির পরিয়েছিলেন শেখ মুজিব। সারা বাংলাদেশ বন্দী। চাটুকার পরিবেষ্টিত মুজিব মাত্র মুক্ত। ভারতের সাপ্তাহিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় '৭৫-এর ১ ফেব্রুয়ারি এই বর্ণনা দিয়েছেন কুলদীপ নায়ারে।

শেখ মুজিবুর রহমান জেনারেল ইয়াহিয়ার স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু আজ তিনি নিজেই রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছেন। ক্ষমতা দখল করতে গিয়ে তিনি 'নিয়মানুবর্তিতা', 'সমাজবিরোধী দল', 'বৈদেশিক চক্রান্ত' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে চলেছেন, যা এক সময় পাকিস্তানী সামরিকচক্রও ব্যবহার করত। আশ্চর্য, বাংলাদেশের জন্মের আগে যে জনসাধারণ এত দুর্ভোগ সহ্য করেছে, তাদের কোনো মতামত নেয়া হয়নি। এমনকি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টিকেও কিছু জানতে দেয়া হয়নি। পার্টির ২১শে জানুয়ারির মিটিং-এ শুধু এটুকুই আলোচিত হয়েছিল যে, শেখকে প্রেসিডেন্ট করা হবে। সদস্যদের এটা জানা ছিল না যে, সুপ্রীম কোর্টকে তারা জ্ঞাত ছিলেন না। শেখ যে নিজের পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারবেন না, তা নয়। কিন্তু আগে থেকে সবকিছু জানিয়ে দিলে পার্টির ভিতর থেকে বিরোধিতা আসত। সম্ভবতঃ মুজিব সেটাই আশংকা করেছিলেন। অন্যথায় এ ধরনের ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক সংশোধন প্রস্তাব এক ঘণ্টার মধ্যে পার্লামেন্টে পাস হত না এবং প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ উল্লাহও পার্লামেন্ট ভবনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তা সই করতেন না। স্পষ্টতঃই আগে থেকে এরূপ ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল এবং তা প্রমাণিত হয় এই থেকে যে, মোহাম্মদ উল্লাহকে মন্ত্রিসভায় নেয়া হয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই। এখন বিচার বিভাগকেও জিঞ্জিরে আটকানো হয়েছে : প্রেসিডেন্ট বিচারকগণকে 'অসদাচরণ' ও 'অক্ষমতার' জন্য বরখাস্ত করতে পারবেন।

এই পটভূমিকায় কি করে মিসেস গান্ধী এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে শেখকে খোশ আমদেদ জানালেন, বোঝা মুশকিল। বাংলাদেশ যাই করুক, সেটা বাংলাদেশের নিজস্ব ব্যাপার। কূটনৈতিক শিষ্টাচার যাই হোক না কেন, বাংলাদেশের প্রতিটি কাজ ভারতের সমর্থন করার কোনো দরকার করে না। অন্ততঃ অভিনন্দনবাণী প্রেরণ বিলম্বিত করা যেত শুধু এটুকু পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যে, বাংলাদেশে যা ঘটছে তাতে ভারত নিরুৎসাহবোধ করছে। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবরে যখন আইউব খান একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, মিঃ নেহরুর প্রতিক্রিয়া ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। লোকসভায় বসে তিনি খবরটি পেয়েছিলেন। সদস্যদের বললেন, 'এটা নগ্ন সামরিক একনায়কত্ব।'

নয়াদিল্লী হয়ত বিশ্বাস করছে যে, এই পরিবর্তন বাংলাদেশে ভারতবিরোধী

www.pathagar.com

মনোভাবকে মোকাবিলা করতে শেখকে সাহায্য করবে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, শেখ ভারতের প্রতি অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন তাজউদ্দিন আহমদকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন (তিন বছর আগে তাজউদ্দিন আহমদ আমাকে বলেছিলেন, 'ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এত ভাল যে, ইচ্ছা করে এখনি মরে যাই, এর অবনতি দেখতে বেঁচে থাকতে চাই না)।' ভারত বিরোধী মনোভাবের কারণ শেখ খুব ভাল করেই জানেন। জিনিসপত্রের অভাব এবং দুর্মূল্যের জন্য জনসাধারণ কষ্ট পাচ্ছে। কাজেই তারা বিশ্বাস করে যে, তারা অসুবিধা ভোগ করছে যেহেতু 'প্রতিটি জিনিস ভারতে চলে যাচ্ছে।' বস্তুতঃ ভারত বিরোধী মনোভাব প্রতিরোধ করার জন্য ঢাকা কিছুই করেনি। সম্ভবতঃ এর একটা কারণ এই যে, ভারত বিরোধী মনোভাব মোকাবিলা করতে হলে সরকারকে জনসাধারণের রোষানলে পড়তে হবে।

শেখ কেন শাসন ক্ষমতা হাতে নিলেন, এটা এখনো বিভ্রান্তিকর লাগে। ১৯৭২ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। গত জুলাই মাসে আওয়ামী লীগ তাকে 'ব্ল্যাংক চেক' দিয়েছিল এবং ডিসেম্বর মাস থেকে দেশ জরুরি অবস্থার অধীনে রয়েছে। কিভাবে অতিরিক্ত ক্ষমতা– যদি ধরেও নেয়া হয় যে, কিছু ক্ষমতার অভাব ছিল– তাকে সাহায্য করবে? জনসাধারণের চাহিদা মিটাতে সরকারের পদক্ষেপ অত্যন্ত মন্থর এবং দুর্নীতি একটি জীবন পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্লোগান ও ফাঁকা বুলি জনগণকে ভুলিয়ে রাখে। যে জাতি পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে উদ্ধতভাবে লড়েছে, সে জাতি আজ আশা হারাতে শুরু করেছে। আজ সেখানে যা ঘটছে তা এই– প্রতিভাবান লোকেরা দেশত্যাগ করতে শুরু করেছেন। জানা যায়, এদের মধ্যে শেখের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদেরও কেউ কেউ রয়েছেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনীতি

ফ্রন্টিয়ার

নিজের অভিলাষ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে জাতিকে বন্দী করতে শেখ মুজিব যে বাকশাল গঠন করেছিলেন তা ছিল তার কাছে 'দ্বিতীয় বিপ্লব'। দমননীতির এই দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনীতির এপিঠ ওপিঠ বিশ্লেষণ করেছে কলিকাতার গবেষণা পত্রিকা ফ্রন্টিয়ার (ভলিউম-বি, নং-২)

ডিক্টেটর মুজিব তথাকথিত 'দ্বিতীয় বিপ্লব' সম্পন্ন করেছেন। শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটিয়ে, বাংলাদেশের জনগণকে মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং 'জাতির পিতা', প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যান-এর দায়িত্ব নিজের ওপর ন্যস্ত করে মুজিব তার নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার লক্ষ্যসমূহ ব্যক্ত করেছেন। ২৬শে মার্চ এক কল্পিত স্বাধীনতা দিবসের চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে তার 'ঐতিহাসিক' ভাষণ শোনার জন্য লাখ লাখ লোক ভিড় করেছিল। মুজিব তার 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' কর্মসূচি ঘোষণার জন্য এই বার্ষিকী অনুষ্ঠানকে বেছে নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা দিবসটি যেমন ছিল মুজিবের একটি প্রতারণা, তেমনি ২৬শে মার্চের জনসভাও ছিল একটি কৃত্রিম সমাবেশ।

একথা অবশ্য সত্য যে, অনেক বাঙ্গালী, মন্ত্রী, আমলা, বিদেশী মেহমান এবং বহু দ্বীন-দরিদ্র এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তারা এসেছিলেন হয় উচ্চশ্রেণীর স্বার্থে, নয় বাধ্য হয়ে নয়ত অনুগৃহীত হয়ে; চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক সমর্থনের কারণে নয়। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই বিরাট জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য ৯০ লাখ (৯ মিলিয়ন) টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। টাকার এই ছাড়াছড়ি এবং সাংগঠনিক দক্ষতার এই মহড়ার বিপরীত দিকটি হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশ সরকার ভান করছেন, জানুয়ারি মাসে রাজধানী থেকে বিতাড়িত লাখ লাখ আশ্রয়হীন মানুষের ঠাঁই করে দেবার মত আর্থিক সঙ্গতি ও প্রশাসনিক ক্ষমতা তাদের নেই। এইসব হতভাগ্যরা শহরের উপকণ্ঠে ক্যাম্পগুলোয় আবদ্ধ হয়ে দিনে দিনে নিস্তেজ, নির্জীব হয়ে পড়ছে। ঢাকা শহর পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মুজিবের উদ্বেগের ফলে এসব নির্দোষ মানুষের প্রতি যে ব্যবহার করা হয়েছে তা 'বাংলার ইতিহাসে বৃহত্তম অপরাধ' বলে জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী গোপনে উল্লেখ করলেন।

সরকারের সামাজিক চরিত্র যা এবং যেভাবে সরকার স্বীয় স্বার্থ বজায় রাখতে চান, তাতে ঢাকার পর্যবেক্ষকরা মুজিব সরকারকে 'ডাকাতের রাজ্য বলে আখ্যায়িত করেন। রাজনৈতিক দলগুলো বিলোপের এবং একমাত্র 'জাতীয় দল' গঠনের পূর্বে (২৪শে ফেব্রুয়ারি)। জোর জল্পনা-কল্পনা চলছিল যে, মুজিব তার প্রাক্তন আওয়ামী লীগ সহকর্মীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার চেষ্টা করছেন। তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এটা অবশ্য সত্য যে, ভূতপূর্ব বিরোধী দলের কয়েকজন সদস্য (যেমন জাসদ ও ভাসানী

www.pathagar.com

ন্যাপের কয়েকজন সদস্য) এবং পার্লামেন্টের কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রতিনিধি (যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের দু'জন এমপি) নতুন দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। মুজিব রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করলেন তখনই যখন মওলানা ভাসানী 'বঙ্গবন্ধু' ও তার 'দ্বিতীয় বিপ্লবকে' স্বাগত জানালেন। মস্কোপন্থী দলগুলোর (মনি সিং-এর সিপিবি ও মোজাফফর ন্যাপ) কার্যালয় 'সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাকেন্দ্রে' রূপান্তরিত হয়েছে। তাহলেও জাতীয় দল অভ্রান্তরূপে প্রাক্তন আওয়ামী লীগেরই বর্ধিত রূপায়ণ। এমনকি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) 'নামেও তা' প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রাক্তন আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয়ের সামনে 'বাকশাল'-এর সাইনবোর্ড ঝোলান হয়েছে। আওয়ামী লীগের সকল সদস্য, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী আপনা থেকে 'জাতীয় দল'-এর সদস্য বনে গেছেন।

তাহলে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন এবং নাগরিক অধিকার মুলতবি রাখার রাজনৈতিক গুরুত্ব কি? নিঃসন্দেহে মুজিবের প্রথম উদ্বেগের কারণ হচ্ছে বামপন্থী দল ও উপদলগুলোর বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান। বাংলাদেশের রাজনীতি এতটা একদলীয় হয়ে গেছে যে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টের অভিযানের অস্ত্র হচ্ছে তার গুপ্ত পুলিশ ও আধা-সামরিক মিলিশিয়া রক্ষীবাহিনী। গ্রাম-বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এরা ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে। ময়মনসিংহ জেলার একটি থানাতেই (নান্দাইল থানা) শত শত তরুণ চাষী ও ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে। এ এলাকার গরীব চাষীদের মধ্যে সিরাজ সিকদারের দলের বিশেষ প্রভাব ছিল এবং গত তিন বছরের শেষেও তারা কার্যতঃ এ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীর হিসাব মতে, রক্ষীবাহিনী গত জানুয়ারিতে এক ময়মনসিংহ জেলাতেই অন্ততঃ ১ হাজার ৫শ কিশোরকে হত্যা করে। এদের অনেকেই সিরাজ সিকদারের 'পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি' (ইবিপিপি)-এর সদস্য ছিল। অন্যদের মার্কসবাদী ও লেনিনবাদী দলের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। এমনকি, অনেক বাঙ্গালী যুবক, যারা রাজনীতিতে ততটা সক্রিয় ছিল না, তারাও এই সন্ত্রাসের অভিযানে প্রাণ হারিয়েছে। রক্ষীবাহিনী কি করে মস্তকবিহীন দেহে 'সিরাজ সিকদার' নামাংকিত পোস্টার পেরেক দিয়ে এঁটে লাশ সদর রাস্তায় ফেলে দিয়েছে, তার বর্ণতা নিহতদের আত্মীয়-স্বজনের মুখে শোনা যায়। বস্তুতঃ বাংলাদেশে বীভৎসতা ও নিষ্ঠুরতার অভাব নেই। যারা সৌভাগ্যবশতঃ রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়েছে, তাদের মুখে 'মধ্যযুগীয়' অত্যাচার পদ্ধতি অনুসৃত হবার কথা শোনা যায়। অত্যাচারের সাধারণ হাতিয়ার লৌহদণ্ড, সুচ, গরম পানি ও অন্যান্য গার্হস্থ্যসামগ্রী। কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দল সম্পর্কে তথ্য উদঘাটনে এগুলো যথেষ্ট কার্যকরী।

www.pathagar.com

তাছাড়া এসব হাতিয়ার প্রয়োগের ফলে শরীরের যে ক্ষতিসাধিত হয়, তার জের চলে সারা জীবন।

কিন্তু এ থেকে এ সিদ্ধান্ত করা ভুল হবে যে, মুজিবের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সকল বিরোধিতা স্তব্ধ হয়ে গেছে। আদৌ তা নয়। বস্তুতঃ জরুরি অবস্থা ও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘোষণার পর থেকে এমপি এবং ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের হত্যা, থানা আক্রমণ, রক্ষীবাহিনী ও 'চরমপন্থীদের' মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ এবং ঢাকায় লক্ষ্যস্থানের ওপর বোমার আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব ঘটনা কয়েকটি ক্ষমতাসীন দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল। (যেমন উত্তরবঙ্গের গাইবান্ধা মহকুমার বাকশালের মহিলা নেত্রীর হত্যা)। কিছুসংখ্যক হত্যা অবশ্য বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে তীব্র অবিশ্বাসের কারণে ঘটেছে (যেমন আবদুল হক পরিচালিত ইস্ট পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি এবং জনৈক মন্টু পরিচালিত জাসদের মধ্যে কুষ্টিয়ার সাম্প্রতিক সংঘর্ষ)। তবে অধিকাংশ সংঘর্ষই মুজিবের ত্রাসের রাজত্বের বিরুদ্ধে মার্কসবাদ-লেনিনবাদী গোপন দলগুলোর প্রবল প্রতিরোধের ফল।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনীতি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। এর প্রধান দিক হচ্ছে বাংলাদেশের বামপন্থী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম। পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলোর বিভিন্ন সংবাদপত্র (যেমন বৃটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর সাপ্তাহিকী-ইকনমিস্ট) মত প্রকাশ করেছে যে, তৃতীয় বিপ্লব প্রবর্তনের মুজিবের নিজস্ব উদ্দেশ্য হল প্রধানতঃ তার নিজের অহমিকা চরিতার্থ করা এবং রাজনৈতিক গৌরবের অন্বেষণ, যে গৌরব পাগলামির নামান্তর। এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, নতুন শাসন ব্যবস্থার রাজনীতিতে আরো অনেক কিছু নিহিত আছে।

www.pathagar.com

শোষিতের গণতন্ত্র

হার্ভি স্টকউইন, ফারইস্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ

মুজিবের যে সম্পদ ছিল তা হলো আত্মম্ভরিতা। এ আত্মম্ভরিতার কাছে সবই হার মানে অর্থাৎ তিনি যা বলেন তাই হয়। প্রতিবাদ করার কেউ নেই– এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি গণতন্ত্র হত্যার মাধ্যমে 'এক নেতা এক দেশ'–এর অভিধায় অভিষিক্ত করলেন নিজেকে। এটাই তার গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্র সর্ম্পকে পর্যবেক্ষণী মন্তব্য হার্ভি ষ্টকউইনের। '৭৫–এর ১৪ মার্চ ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এ মন্তব্য।

আর একটি এশীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা হলো। আর একবার অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে গণতন্ত্রকে ঝেটিয়ে বিদায় দেয়া হয়েছে। বৃটিশ শাসনের অবসানের পর এই দ্বিতীয়বার বাংলাদেশের জনগণের জন্য গণতন্ত্র অনুপযোগী বিবেচিত হয়েছে। ফিল্ড মার্শাল আইউব খানের বিদেহী আত্মা নিশ্চয়ই স্মিত হাস্যে মৃদুস্বরে বলেছে, "আমি তোমাদের বলেছিলাম....."। ১৯৫৮ সালে আইউব কর্তৃক ক্ষমতা জবরদখল গণতন্ত্র বিরোধী ছিল। তিনি নেতৃত্বের অভাব লক্ষ্য করেছিলেন এবং জাতীয় জীবনে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক শূন্যতা পূরণ করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। ১৯৭৫ সালে সে পটভূমি আদৌ নেই। শেখ আগেও বাংলাদেশের একমাত্র মুখ্য নেতা ছিলেন, এখনো আছেন। যে সময় তিনি আইউবের রূপ পরিগ্রহ করেন, তখন গণতন্ত্র এমন কাটছাঁট হয়ে যায় যে, তার ক্ষমতার অভাব ছিল একথা তিনি আদৌ বলতে পারতেন না। আউবের মতো তিনি সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে জড়িত করছেন না। যদিও নতুন একক জাতীয় দলে কয়েকজন সামরিক চাঁইকে কো–অপ্ট করে নেয়া হতে পারে। দ্বিতীয় বিপ্লবের আগেও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কতকটা সামরিক ছোঁয়াচ দেবার ক্ষমতা শেখের ছিল। কেননা, সামরিক প্রথার গঠিত এবং মুজিবের ব্যক্তিগত বাহিনী বলে সাধারণতঃ পরিচিত রক্ষীবাহিনীকে বরাবরই অপ্রীতিকর কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত করা হয়েছে।

দাঙ্গা, বিক্ষোভ দমন করা এবং সন্ত্রাসবাদী ও বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করা– এগুলো রক্ষীবাহিনীর কাজ। "নীতি প্রতিষ্ঠা" ও "দুর্নীতি দমন" একচ্ছত্র ক্ষমতা গ্রহণের মামুলি অজুহাত মাত্র। আইউব ও মুজিবের ক্ষমতা দখলে পার্থক্য রয়েছে। আইউব ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন জাঁদরেল পাচারকারী ও কালোবাজারীকে পাকড়াও করেছিলেন। এতে সারা পাকিস্তানে বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। গোটা দেশে চালের দামও কমে গেল। পরে অবশ্য দুর্নীতি আবার দেখা দেয়–এমনকি আইউবের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেও। শেখের 'দ্বিতীয় বিপ্লব' আজো তেমন ধরনের নাটকীয় অভিযান করে নাই। বস্তুতঃ দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এতো

www.pathagar.com

সামান্য যে, চালের দাম বেড়েই চলছে। "শোষিতের গণতন্ত্র"কে আদৌ কোনো সুযোগ দিতে অনিচ্ছুক জনৈক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মন্তব্যে আইউব-শেখ চারিত্রিক সাদৃশ্য সঠিকভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বললেন, "আইউব যে ভুল করেছিলেন, শেখও ঠিক সেই ভুলই করছেন। আইউব বিশ্বাস করতেন যে, জনসাধারণ কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতিই চায়। তাই তিনি মানবীয় অধিকারের বিনিময় অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পেছনে ছুটলেন। এর ফলেই মুজিব আন্দোলনের মওকা পেয়ে গেলেন। শেখ সে কথা ভুলে গেছেন অথবা ভাবেন যে, তিনি তা ভুলে যেতে পারেন।"

বৃটিশ আমলে প্রশাসনিক দিক দিয়ে পূর্ববঙ্গ ছিল উপেক্ষিত। দেশ বিভাগের সময় ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা এক হাতের আঙ্গুলে গোনা যেত। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের আমদানি হলো। বাংলাদেশীদেরাও আজ খোলাখুলি স্বীকার করেছেন যে, স্বাধীনতার পর কয়েকটি অত্যাবশ্যক সার্ভিসের, বিশেষ করে রেলওয়ে ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অবনতি ঘটেছে। আগে প্রধানতঃ বিহারীরাই এসব সার্ভিস চালাতো। এখন আর ওদের চাকরি নেই।

কোনো কোনো দেশে ব্যক্তি–স্বাধীনতাবিরোধী শাসনপদ্ধতি অধিকতর কার্যদক্ষতা অর্জন করেছে, কিন্তু বাংলাদেশে তা সম্ভব হবে কিনা গভীর সন্দেহ রয়েছে। রাজনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশের নতুন শাসনপদ্ধতি সবকিছু প্রেসিডেন্টের হাতে অতিরিক্ত মাত্রায় কেন্দ্রীভূত করে চলছে।

সোকারনো পাশ্চাত্য সাহায্যকারী দেশগুলোকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন। ইলাস্টেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়ার এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে শেখও অনুরূপভাবে পশ্চিম জগতের সংবাদপত্রগুলোকে ঘা মেরেছেন। "বাংলাদেশ ধসে পড়বে", বিদেশী পত্র–পত্রিকার এ ধরনের ভবিষ্যদ্বানী সম্পর্কে তার অভিমত জানতে চাইলে শেখ জবাব দেন, "তাদের গোল্লায় যেতে বলে দিন। আমার শাসন নয়, তাদেরই বুদ্ধিমত্তা ধসে পড়বে। পাশ্চাত্য সংবাদপত্রগুলো শুধু সমালোচনা করেছে আর উপদেশ দিচ্ছে। ১৯৭১ সালেও তারা তাই করেছিল, এখনও আবার করছে।" (এই উক্তি কৌতূহলজনক, কেননা মুক্তি সংগ্রামের সময় বিদেশী সংবাদপত্রের ভূমিকা বাংলাদেশ এ পর্যন্ত প্রশংসা করে এসেছে)।

নিরাপত্তাবোধের অভাবেই শেখকে অস্পষ্ট, এমনকি কাল্পনিক, ভীতির বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে প্ররোচিত করেছে। একমাত্র আত্মবিশ্বাসের অভাবের জন্য (এবং সুপরামর্শ গ্রহণের অনিচ্ছার জন্য) ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের "ডি ফেকটো" প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েও শেখ বাংলাদেশের ঠায় বসে রইলেন। তার চাইতে অধিকতর আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তিত্ব সে সময় গোটা পাকিস্তানের

www.pathagar.com

জনসমর্থন লাভে সমর্থ হতেন এবং ফলে পরবর্তী গৃহযুদ্ধের মর্মান্তিক ট্রাজেডি এড়াতে পারতেন। নিরাপত্তাবোধ নেই বলেই বিনা বাঁধায় সর্বময়কর্তৃত্ব গ্রহণের মুহূর্তেও শেখ শিক্ষিত সমাজকে আঘাত করেছেন এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, "আমিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়েছিলাম এবং পড়াশুনা করেই পাস করেছিলাম।" শেখ গৌণ বিষয়ে যেমন বিদেশী সংবাদপত্রের সমালোচনা এবং দেশী পত্রিকার নিয়ন্ত্রণে (দেশী সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আগেই খর্ব করা হয়েছে) মাথা ঘামাচ্ছেন। নিরাপত্তাবোধের অভাব থেকে হৃদয়ের সংকীর্ণতা, মনোভাবের তুচ্ছতা এমনকি প্রতিহিংসা পরায়ণতাও দেখা দেয়।

এ ধরনের প্রবৃত্তি শেখের ব্যক্তিগত উদার চরিত্রকে সময় সময় বিকৃত করেছে। এমনও হতে পারে যে, এগুলো দ্বিতীয় বিপ্লবের মারাত্মক ত্রুটি হয়ে দাঁড়াবে।

www.pathagar.com

মুজিব বাংলাদেশের মনিব

জো গেল্ডেলম্যান, শিকাগো ডেইলী নিউজ

গণতন্ত্রের জন্য হা-পিত্যেশ করে করে শেখ মুজিব শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হলেন সামন্তযুগীয় প্রভুর ভূমিকায়। নিজে ভারতের সেবাদাস হয়ে বাংলাদেশের মানুষদের মনে করতে লাগলেন ক্রীতদাস হিসাবে। এহেন মনিব শেখ মুজিব সম্পর্কে শিকাগো থেকে প্রকাশিত ডেইলী নিউজ পত্রিকায় লিখেছেন জো গেল্ডলম্যান-যা প্রকাশিত হয় ২৩ জুন '৭৫ তারিখে।

১৯৭২ সালে যখন মুজিব ক্ষমতা লাভ করেন, তখন অনেক বাঙ্গালী আশংকা করেছিলেন যে, তিনি "আরেকজন কেরেনেস্কী" (যে সোশ্যালিস্টকে বিতাড়িত করে রাশিয়ায় কমিউনিষ্টরা ক্ষমতা দখল করেন) হবেন মাত্র। কারণ মুজিবের প্রকৃত জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে প্রশাসনিক কাঠামো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থহীন ছিল। এমনকি পুলিশও জনসাধারণের কাছে হাস্যকর ছিল। তার প্রমাণ এই যে, বাংলাদেশের প্রথম দুই বছরে কোনো আইন-শৃংখলার অস্তিত্ব ছিল না।

বাংলাদেশ দ্রুত অব্যবস্থা ও অরাজকতায় নিমজ্জিত হলে গত বছরের শেষে মুজিব অপ্রত্যাশিতভাবে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। এ বছর জানুয়ারি মাসে আর একটি অনুরূপ পদক্ষেপ তিনি নিজেকে একদলীয় রাষ্ট্রের "রাষ্টপতি" ঘোষণা করেছেন। হিতৈষী একনায়কের পোশাকে সজ্জিত হতে "শেখ সাহেব" বিন্দুমাত্র দেরি করেননি। তিনি শহরেরর ভূস্বামীদের ৪৮ ঘন্টা সময় দিলেন তাদের বাড়ির দেয়ালে অংকিত রাজনৈতিক শ্লোগান সব মুছে ফেলতে। তিনি সকাল দশটায় সেক্রেটারিয়েটের গেট বন্ধ করে দিলেন। বিলম্বে আগত কর্মচারীরা ঢুকতে পারলেন না। তিনি ভিক্ষুকদের শহরের বাইরে সরিয়ে দিয়েছেন, বস্তিগুলো ভেঙ্গে সাফ করে ফেলেছেন। এই করতে গিয়ে গুঁটি বসন্তের প্রকোপ বাড়িয়েছেন। কিন্তু উদ্বাস্তুরা আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে। ভিক্ষুকেরা ফিরে এসেছে এবং বসন্তরোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য (মুক্তি সংগ্রামের সময় থেকে এক লাখ বন্দুক, রাইফেল ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র লোকজনদের হাতে রয়েছে যার ফলে হাজার হাজার রাজনৈতিক হত্যা সংঘটিত হচ্ছে) শেখ তার নিজস্ব ভয়াবহ ও ঘৃণ্য জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করেছেন।

জনৈক বিদেশী সাংবাদিক একটি প্রখ্যাত ম্যাগাজিনে রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে সমালোচনা করার পর স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, রক্ষীবাহিনী বাংলাদেশ সরকারের কাছে প্রিয় আলোচ্য বিষয় নয়। নীরবে হুকুম জারি হলো, উক্ত সাংবাদিককে ফের বাংলাদেশে ঢুকতে দেয়া হবে না। এই স্পর্শকাতরতা কেন? সম্ভবতঃ এ জনই যে রক্ষীবাহিনী বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও পরিবহন ব্যবস্থাসহ একটি আধা সামরিক প্রতিষ্ঠান।

www.pathagar.com

অথবা রক্ষীবাহিনীর বিব্রতকর সংখ্যা এর কারণ হতে পারে। এখনই এর সংখ্যা ২৫ হাজার এবং পরিকল্পনা থেকে বুঝা যায় যে, যখন চূড়ান্ত রূপ নিবে তখন রক্ষীবাহিনী পাকিস্তান, এমনকি বৃটিশ আমলে যে সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখা হতো, তা ছাড়িয়ে যেতে পারে।

'জাতির পিতা'র নামে রক্ষীবাহিনী ব্যাপক উৎপীড়ন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। বস্তুতঃ এর প্রতীক হচ্ছে একটি আর্মব্যান্ড। ব্যান্ডের ছবিতে তর্জনী উপরের দিকে উঁচিয়ে আছে–যা মুজিবের সচরাচর বক্তৃতাকালীন ভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে। বাঙ্গালীরা বলেন, গোপনে সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপক অভিযান চালানো হচ্ছে। পাকিস্তানী আমলে যা করা হতো তা থেকে এ আদৌ তফাৎ নয়। একমাত্র রুদ্ধদ্বারের অন্তরালে লোকজন মুখ খুলে কথা বলে। ঢাকায় অবস্থানরত জনৈক ভারতীয় সাংবাদিক যেমন বলেছেন, "ঢাকার বিখ্যাত প্রেসক্লাবে যারা সবরকম বিষয়ে কথা বলতেন, এখন তারা শুধু আবহাওয়া, কানাডা- এ ধরনের বিষয়ে কথা বলেন।" অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ দমন করা ছাড়াও সরকার সংবাদাদি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করছেন, যা বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির পক্ষে শুভ নয়। হংকং নিউজ ম্যাগাজিনে মুজিবের বিরুদ্ধে লেখার জন্য জনৈক সাংবাদিককে বাংলাদেশের নিউজ এজেন্সি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

যারা বিদেশী সংবাদপত্রে খবরাদি প্রকাশ করবে তাদেরও অনুরূপ প্রতিশোধের সম্মখীন হতে হবে। যেমন হয়েছেন বাংলাদেশে সিভিল লিবার্টির একজন প্রধান আইনজীবী। তিনি বেনামে সোনার বাংলা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তা মুখরোচক ছিল না। হদিস পাওয়ার পর তাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। সংবাদ সম্পর্কীয় বাঁধা-নিষেধের ফলে বাঙ্গালীরা আহতবোধ করেছেন। এ ব্যবস্থা অবলম্বনের সার্থকতা থাকতো যদি বাংলাদেশের ভয়াবহ সমস্যাগুলোর উপশম হতো। এ ধরনের আশ্চর্য পরিবর্তন বাস্তবতার নিরিখে আদৌ সম্ভবপর বলে মনে হয় না।

বাংলাদেশের মাথাপিছু বার্ষিক গড়পড়তা আয় ৫০ ডলার–স্বাধীনতার আগে যা ছিল তার চেয়ে কম। এ ভয়াবহ অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য বিদেশী সাহায্য চেয়ে মুজিব সরকার "রিলিফ ডিপ্লোমেসি" চালিয়েছেন। সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলো বন্যা ও দুর্ভিক্ষের যারা শিকার হয়েছে তাদের ছবি যতোটা সম্ভব ছাপিয়েছে–সংবেদনশীল কূটনৈতিক বিবেককে স্পর্শ করার জন্য। "এক সময় এমন হয়ে দাঁড়ালো যে, এসব ছবি দেখার পর সকালে নাশতা খাওয়া হতো না" –অভিযোগ করলেন জনৈক ভারতীয়।

www.pathagar.com

বিদেশী সাহায্যসামগ্রীর অধিকাংশ বাজারে প্রকাশ্য বিক্রি হয়। কম্বল, জ্যাম, টিনের খাদ্য, গুঁড়োদুধ– সবকিছু (বিশেষ মূল্য দিলে) ঢাকার দোকানপাটে পাওয়া যায়। একটি দূতাবাসের হিসাবে–দূতাবাসটি পশ্চিম দেশীয় নয়– বিদেশী সাহায্যের ১৫ পার্সেন্টেরও কম জনসাধারণের হাতে পৌঁছায়। শেখ মুজিবের ভাগিনা শেখ মণিকে গত দুর্ভিক্ষের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, "দোষ আমাদের সরকারের নয়, দোষ সেসব সরকারের যারা প্রতিশ্রুতি দিয়েও সময়মতো খাদ্যশস্য পৌঁছে দেননি।" শেখ মণি অবশ্য উপাদেয় খাবার খান। স্বাধীনতার পর তিনি একজন ক্ষমতাসম্পন্ন যুব রাজনৈতিক নেতা বনেছেন। তিনি দু'টি সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং দু'টি গাড়ী ও দু'টি "দখল করা" বাড়ির মালিক। মামা মুজিবের ক্ষমতায় আসার পর শেখ মণি –যাকে বিদ্রুপকারীরা "জাতীয় ভাগিনা" বলে অবিহিত করেন– হঠাৎ করে অজস্র টাকার মালিক হয়ে গেছেন।

আমেরিকান সুপরিচিত একজন বাঙ্গালী বিশ্লেষক বলেন, "মুজিবকে মেয়র ড্যালীর সমগোত্রীয় মনে করতে হবে। দুর্নীতি অবশ্যই আছে। কিন্তু মুজিব যে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে কাজ পরিচালনা করেন তা যদি ঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারে।" ইত্যবসরে যেভাবে মুজিবকে সিদ্ধপুরুষ করে তোলা হচ্ছে তাতে চেয়ারম্যান মাও–এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশাল সুশোভিত প্রাচীর পত্রে বাংলাদেশের ইতিহাসের দৃশ্যাবলী চিত্রিত করা হয়েছে। একটি চিত্রে সাহসী মুজিব– তার চোঁয়ালে হা' হয়ে আছে– 'তার' জনগণকে অদ্যাবধি অনাবিস্কৃত এক ঐশ্বর্যের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তায় রাস্তায় মুজিবের ছবি ও তার বিক্ষিপ্ত বক্তৃতার উদ্ধৃতি শোভা পাচ্ছে। এ কারণে ঢাকার অনেকে অভিযোগ করেন যে, মুজিবের নিজেকে পরাক্রমশালী ভাববার নির্লজ্জ বাতিক আছে। তার নাম লিপিবদ্ধ করতেই সংবাদপত্রের প্রায় সাড়ে তিন কলাম দরকার হয়। সচরাচর তাকে "কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের (বাংলাদেশের এক মাত্র পার্টি) চেয়ারম্যান, জাতির পিতা, রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান" বলে আখ্যায়িত করা হয়। জনৈক পর্যবেক্ষক নাক কুঁচকে বলেলেন, "দশবার দ্রুত এ নাম জপ করুন, আপনি সরকারের মন্ত্রী হয়ে যাবেন।"

www.pathagar.com

১৫ আগস্ট '৭৫–এর পরবর্তী পর্যায়ে

www.pathagar.com

মুজিব নিজেই দায়ী

মার্টিন উলাকট, লন্ডন গার্ডিয়ান

আধুনিক বিশ্বে মধ্যযুগীয় সামন্ত প্রভুর ভূমিকায় অবতীর্ণ শেখ মুজিব পর্দার আড়ালে তার প্রভুর সুতার টানে মঞ্চের ভিত্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছিলেন। মাটি পেতে শেষ রক্ষায় ত্রুটি করেননি তিনি। কিন্তু গোড়াতেই গলদ নিয়ে যে মুজিবের আবির্ভাব তিনি কিভাবে শুদ্ধ হবেন? এই বিশ্লেষণই করেছেন লন্ডন গার্ডিয়ান পত্রিকার মার্টিন উলাকট। এবং তা ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট অর্থাৎ শেখ মুজিবের পতনের একদিন পরে।

সামরিক অভ্যুত্থানের বিস্তারিত খবর স্পষ্ট না হলেও এর কারণ মোটামুটি সুস্পষ্ট। শেখ মুজিবের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক কারসাজি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। একমাত্র বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মুজিবের প্রখ্যাত রাজনৈতিক দক্ষতা ও তীব্র অসন্তোষ অনুধাবন করতে কিংবা তা নিরসন করতে সহায়ক হয়নি।

মুজিবের মৃত্যুর নির্মম পরিহাস এই যে, পাকিস্তানীরা তাকে হত্যা করেনি, তার দেশবাসীরাই তাকে হত্যা করেছে। এতে বুঝতে পারা যায়, কত দ্রুত বাংলাদেশ আশার উচ্চ শিখর থেকে হতাশা ও নৈরাশ্যের অতল গহ্বরে নেমে এসেছিল, যার ফলে এই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে।

এর জন্য বহুলাংশে দায়ী মুজিব নিজে। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র চলাকালে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মুজিব কোনো সংস্কার সাধনে, এমনিক একটি যোগ্য, সৎ প্রশাসন গড়ে তুলতেও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু নিজের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য এবং দেশে কিছুটা প্রগতি আনার জন্য শেষ পদক্ষেপই তার পতন ডেকে এনেছে। বামপন্থী আদর্শে তিনি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সেনাবাহিনী তার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। অথচ তাদের সমর্থনেই তিনি প্রথম ক্ষমতায় এসেছিলেন।

গত বছরের মাঝামাঝি মুজিব ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার সরকার দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। শোচনীয় জীবনযাত্রার মান আরো শোচনীয় হয়ে পড়েছে। সপ্তাহে গড়ে সাতটি করে রাজনৈতিক খুন সংঘটিত হচ্ছিল। আর দেশে ব্যাপক দুর্নীতি চলছিল, যার জন্য মুজিব ও তার পরিবারকে দায়ী করা হতো।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে স্বাধীনতার পর থেকে ১২ হাজার মিলিয়ন পাউন্ড বিদেশী সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতির অবক্ষয় কমেনি। কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের কারসাজিতে দেশের কৃষিনীতিও পঙ্গু হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আওয়ামী লীগের চাঁই। এ অবস্থায় মুজিব নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজছিলেন। তাতে

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্য মস্কোপন্থী দলগুলোও উৎসাহ যুগিয়েছিল।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে মুজিব দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। এ বছর জানুয়ারি মাসে তিনি শাসনতন্ত্র সংশোধন করে কার্যতঃ এক নতুন সংবিধান সৃষ্টি করলেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুজিবের হাতে সমস্ত কার্যকরী ক্ষমতা ন্যস্ত হলো, এমনকি বিচার বিভাগের কর্তৃত্বও। জাতীয় দল ছাড়া আর সব রাজনৈতিক দল বেআইনী ঘোষিত হল।

কয়েক মাস বিশেষ কিছু ঘটেনি। মুজিব মধ্যযুগীয় নৃপতির মতো অফিসে দরবারে বসতেন, বন্ধ-বান্ধব ও সহকর্মীদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতেন, গল্প বলতেন এবং অনুগ্রহ প্রার্থীদের বিদায় করতেন। তার নতুন মন্ত্রিসভায় পুরান মন্ত্রীরাই ছিলেন। দু-একজন টেকনোক্রেটকেও নেয়া হয়েছিল।

মে মাসে মুজিব ঘোষণা করলেন যে, গ্রামে গ্রামে বাধ্যতামূলকভাবে কৃষি সমবায় গঠন করা হবে, গ্রামাঞ্চলে প্রশাসনিক পরিবর্তন করা হবে এবং জাতীয় দল গ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। সংক্ষিপ্ত হলেও এ কর্মসূচি আওয়ামী লীগ, সেনাবাহিনী, পেশাদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকেই আতংকিত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, মুজিব তার চিরদিনের সমর্থকদের যেমন পেশাদার ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভেঙ্গে এমন একটি দল গঠনের চেষ্টা করছেন যা তার হুকুম অন্ধভাবে তামিল করবে। এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, প্রশাসনিক কাউন্সিল গঠন করে তিনি আমলাতন্ত্রকেও ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন।

আগেই বিরোধী দলগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। জুন মাসে সংবাদপত্রগুলোও সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হলো। আওয়ামী লীগের চাঁই ও মন্ত্রীরা বুঝতে পারলেন যে সম্ভবতঃ তাদের দিন ঘনিয়ে আসছে।

আওয়ামী লীগের ঊর্ধ্বতন নেতৃবর্গ মুজিবকে জানতেন, তারা আরো জানতেন কি করে মুজিব একে একে দলের ভিতরকার বিরোধী গ্রুপগুলোকে ধ্বংস করেন। ফেব্রুয়ারি মাসেই আওয়ামী নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে, নতুন মন্ত্রিসভা একটি 'সাময়িক ব্যবস্থা' মাত্র এবং এর ব্যাপক 'পরিশোধনের' জন্য মুজিব সুযোগের অপেক্ষা করছেন।

এসব মন্ত্রীর মধ্যে একজন হচ্ছে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ, যিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে সদ্য ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। ১৯৭১ সালে কলিকাতায় অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের তিনি বৈদেশিক মন্ত্রী ছিলেন। খন্দকার ডানপন্থী বলে পরিচিত। সহকর্মী তাজউদ্দীনের ভাগ্য বিপর্যয় থেকে হয়তো তিনি ছবক নিয়েছিলেন।

তাছাড়া আদর্শগত প্রশ্নও ছিল। মুজিব নতুন জাতীয় দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে অনেক মস্কোপন্থী রাজনীতিবিদকে স্থান দিয়েছিলেন। ফলে আওয়ামী লীগের ভিতরে

www.pathagar.com

ও বাইরে প্রাচীনপন্থী মুসলমানগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, নতুন শাসকরা বাংলাদেশকে 'ইসলামিক রিপাবলিক' ঘোষণা করেছেন।

সর্বোপরি, স্বাধীনতার পর থেকে মুজিব সেনাবাহিনীকে আঘাত করে আসছিলেন। শুরু থেকে ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনীর অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত রক্ষীবাহিনী বাংলাদেশ সামরিকবাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। রক্ষীবাহিনী একই সঙ্গে প্রেসিডেন্টের প্রহরী, গোয়েন্দা পুলিশ ও বিকল্প সেনাবাহিনী ছিল। আয়ারল্যান্ডের ব্ল্যাক এন্ড টেন্স ও জার্মানির ব্রাউন শার্টের সঙ্গে এদের তুলনা করা যায়।

১৯৭৩ সাল পর্যন্ত রক্ষীবাহিনীতে ভারতীয় উপদেষ্টা ছিল। এর পরেও রক্ষীবাহিনীর অফিসাররা ট্রেনিং-এর জন্য ভারতের দেরাদুনে যেতো। রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা ২০ হাজারে দাঁড়িয়েছিল। লক্ষ্য ছিল আরো অনেক বেশি।

রক্ষীবাহিনীর সংখ্যার জন্য নয়, যেভাবে সরকার তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাতো তাতেই সেনাবাহিনী ক্ষুব্ধ হয়েছিল। প্রচুর টাকা খরচ করা হতো রক্ষীবাহিনীর ব্যারাক তৈরি করার জন্য। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের বেশিরভাগই পেতো রক্ষীবাহিনী। আর সেনাবাহিনীকে সন্তুষ্ট থাকতে হতো সেকেলে অস্ত্রপাতি নিয়ে। রক্ষীবাহিনীকে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় রাইফেল-এ সজ্জিত করার আলাপ-আলোচনা চলছিল। অথচ সেনাবাহিনীর হাতে পুরানো ৩০৩ রাইফেলের বেশি কিছু নেই।

সামরিক অভ্যুত্থানে রক্ষীবাহিনীর ভূমিকা স্পষ্ট নয়। যদি তারা সমর্থন করে থাকে হয়তো করেছে– তা এজন্যে যে, রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তাদের অনেকেই সেনাবাহিনীর ভূতপূর্ব অফিসার এবং তারা সেনাবাহিনীর সঙ্গে একমত হয়েছেন যে, দেশে একটিমাত্র সামরিক বাহিনী থাকবে।

যেভাবেই হোক, রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অসন্তোষই হচ্ছে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ এবং এক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আর এক সেনাবাহিনী গঠন করে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার যে নীতি মুজিব গ্রহণ করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়েছে।

www.pathagar.com

অবশ্যম্ভাবী পতন

কেভিন রেফার্টি, ফিনান্সিয়াল টাইমস

অন্তসারশূন্য গলাবাজি, বাগাড়ম্বর দিয়ে শেখ মুজিবের যে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ছিল মূলতঃ ফাঁপা। মিথ্যা অহমিকায় ভর করে তিনি নিজেকে যে আকাশচুম্বী অবস্থানে ভাবতেন, আসলে প্রকৃত অবস্থা থেকে তার ফারাক ছিল বেজায়। প্রকৃতির নিয়মেই তাই ভিত্তিহীন শেখ মুজিবের পপাত পতন ঘটেছিল যা রোধের উপায় তার ছিল না। ১৯৭৫ সালে ১৬ আগস্ট লন্ডনের ফিনান্সিয়াল টাইমস পত্রিকার কেভিন রেফার্টি সেই পতনের আলোকপাত করেছেন।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির সূত্রপাত হয় গত বছরের মাঝামাঝি সময়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মুজিব ভারতে ধান, চাল ও পাট পাচারের বহর দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে, মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছিল। অপরদিকে যখন লাখ লাখ বাঙ্গালী না খেয়ে মরেছে, তখন মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহচররা চোরাচালানের ব্যবসায় মোটা অংক কামাই করেছে– রাতারাতি ধনী হয়ে উঠেছে।

চোরাকারবার থামাবার জন্য মুজিব সেনাবাহিনীকে তলব করলেন, কিন্তু তাদের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিতে রাজী হলেন না, বরং রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে একযোগে কাজ করার জন্য চাপ দিলেন। বিশেষ সুবিধাভোগী রক্ষীবাহিনী মুজিবের প্রতিরক্ষার জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীর প্রতি সেনাবাহিনীর বিশেষ বিরাগ ছিল। সেনাবাহিনীর জনৈক অফিসার মন্তব্য করেছিলেন যে, 'রক্ষীবাহিনী শুধুমাত্র ঢাকাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম, কেননা তারা স্থানীয় গুন্ডাদের তুলনায় উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ঠগদের নিয়ে গঠিত।'

সেনাবাহিনীর অসন্তোষ চাপা দেয়ার জন্য মুজিব একদিকে কোনো কোনো অফিসারকে প্রমোশন ও অপরদিকে সময় সময় মেজর, লেঃ কর্নেল ইত্যাদি মাঝারি পদমর্যাদার অফিসারদের অপসারণের নীতি গ্রহণ করেন।

চোরাচালানকারী দমনের অভিযান সফল হয়নি। কারণ, বেশিরভাগ দোষী ব্যক্তি সরকারের আশ্রয় লাভে সমর্থ হয়। কিন্তু এই অভিযান চলাচালে সেনাবাহিনী ক্ষমতার কিছুটা আস্বাদ পেয়েছিল। এতে তাদের অসন্তোষ আরো বেড়ে যায় এবং তারা সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকে।

পরের অংক শুরু হয় গত বছরের শেষদিকে। শেখ মুজিব দেশের গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র পাল্টিয়ে, জুরুরি অবস্থা ঘোষণা করে নিজেকে প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত করলেন এবং সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে দিয়ে তিনি একটি নতুন একদলীয়

www.pathagar.com

শাসন প্রবর্তন করলেন। চারটি ছাড়া বাদবাকী সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হল। সারাদেশকে ৬১টি নতুন জেলায় বিভক্ত করা হল।

নিজের বিশ্বাসে অটল থাকার মতো সৎসাহস শেখ মুজিবের কোনো দিনই ছিল না। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের চাপে একক দল পুরাতন পাপীদের ভিড়ে নতুনত্ব লাভ করতে ব্যর্থ হলো। এদের অনেকেই সাধারণ মানুষ দুঃখ-দুদর্শাকে পুঁজি করে রাতারাতি সম্পদশীল হয়ে উঠেছিল।

সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা মুজিব নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করে নিয়েছিলেন। ফলে, নিতান্ত সামান্য ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিতে মাসের পর মাস লেগে যেতো। কারণ, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তার কাছে না পৌঁছালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর ছিল না। শাসন ব্যবস্থার এ দুর্বলতা সবসময়েই সুস্পষ্ট ছিল।

মুজিব তোষামোদপ্রিয় ছিলেন এবং ক্রমেই চাটুকারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে উঠেছিলেন। এই চাটুকারের দল সযত্নে তার কাছ থেকে অপ্রিয় সত্য গোপন করে রাখত। সংবাদপত্রের ওপর নির্দেশ জারি করা হয়েছিল মুজিবের বড় ফটো ফলাও করে ঘন ঘন ছাপাবার জন্য।

তার নিজের পরিবারের লোকজনের আর্থিক স্বার্থ আদায়ের প্রতি তার নজর ছিল। তিনি নিজে ঘুষ নিয়েছেন কি না এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। কারণ তা নেয়ায় তো তার প্রয়োজন ছিল না। বাংলাদেশের কাগজের নোটের ওপর তার ছবি ছাপা হয়েছিল। সবচেয়ে গরীব দেশের প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট পদের সঙ্গে যেসব ব্যয়বহুল সুযোগ-সুবিধা সম্পৃক্ত সবই তার করায়ত্তে ছিল।

তবে অনেকেই তার ছেলেদের এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। ইদানীং ঢাকার লোকমুখে একটা গল্প প্রায়ই শোনা যায়। তাহলো– পুলিশ দু'জন কম বয়স গুন্ডাকে ধরেছে। গ্রেফতারকারী পুলিশ অফিসার তার উপরের অফিসারের কাছে জানতে চাইলেন গুন্ডা দু'টিকে বিচারে সোপর্দ করা ঠিক হবে কিনা। ওপরের অফিসার তার ওপরের অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি জিজ্ঞেস করলেন তার ওপরের অফিসারকে এবং এইভাবে বিষয়টি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট মুজিবের কাছে আসলো। শেখ মুজিব তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কামাল-জামাল কি ঘরে ফিরেছে?' বেগম সাহেবা জবাব দিলেন, 'হ্যা, ফিরেছে।' একথা শোনার পর শেখ পুলিশকে তরুণ গুন্ডা দুটিকে বিচারের জন্য সোপর্দ করতে অনুমতি দিলেন। এ গল্পটি সত্য না বানানো তা বিচার করতে যাওয়া অবান্তর। কারণ বহু লোক এ গল্পের সত্যতায় বিশ্বাস করে এবং এ গল্প বহু লোকের মধ্যে অসন্তোষ বাড়িয়েছে।

www.pathagar.com

কিছুকাল আগে শেখ পরিবারের দু'অংশের মধ্যে ঘরোয়া সংঘাত দেখা দেয়। তার ফল হিসেবে বেশ কয়েকটি জীবন বিনষ্ট হয়েছে। একটি বিবদমান অংশের প্রধান ছিলেন মুজিবের ছেলে কামাল এবং অপরটির প্রধান ছিলেন তার ভাগিনা শেখ মণি। শেখ মণির পেছনে বেগম মুজিবের সমর্থন ছিল।

স্বজনপ্রীতির প্রশ্নটি এ বছরে বড় হয়ে ধরা পড়ে। শেখ মুজিবের বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মীরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন যে, শেখ তার ভাবী উত্তরাধিকারী হিসেবে ভাগিনা শেখ মণিকে গড়ে তুলছেন। প্রতিটি ব্যাপারে তিনি ভাগিনার পরামর্শ নিতেন। দেশব্যাপী সংবাদপত্র নিধন অভিযানের মুখে যে কয়টি পত্রিকা টিকে থাকতে পেরেছে তার একটি হলো শেখ মণির পত্রিকা।

কার্যতঃ মাস কয়েক আগেই অবশ্যম্ভাবী পতনের দ্বার খুলে দেয়া হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহন দিয়ে শক্তিশালী করা হচ্ছে দেখে সেনাবাহিনী শংকিত হয়ে পড়ল। কয়েকটি রাজনৈতিক উপদলও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, কেননা একদিকে তাদের অপসারিত করা হচ্ছে, কিন্তু অপরদিকে তাদের চেয়েও বেশি দুর্নীতিবাজদের অবাধ লুটতরাজের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। পদে পদে ভারতের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়বে দেখে সাধারণ মুসলমানরাও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। তাদেরকে পাশ কাটিয়ে একটা পারিবারিক বাদশাহীর ভীত গড়ে তোলা হচ্ছে দেখে মন্ত্রিসভার সদস্যরাও আতংকিত হয়ে উঠেছিলেন।

www.pathagar.com

কিসে ভুল হলো ?

এন্থনী মাসকারেনহাস, সানডে টাইমস

পূজারী পরিবেষ্টিত শেখ মজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতার বদলে নিজের অহমিকার খোরাক চেয়েছেন বার বার। তাই স্বাধীন বাংলাদেশকে দেখার সুযোগ তার হয়নি। উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন নিজের ভুল কোথায়। ১৯৭৫ সালের ১৭ আগষ্ট লন্ডনের সানডে টাইমস পত্রিকায় এন্থনী মাসকারেনহাস উল্লেখ করেছেন সেই ভুলের কথা।

১৯৭২ সালে নব-প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে ফিরে এসে শেখ মুজিবুর রহমান বীরের সংবর্ধনা পেয়েছিলেন। তিনি তখন সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। গত সপ্তাহে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হয়েছেন। দু'টি ঘটনার মাঝখানের ক'বছর তার সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণের মোহ কেটে গেছে এবং সোনার বাংলার স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে। কিসে ভুল হলো।

মুজিবেবর ট্রাজেডি এই যে, চার বছরের কম সময়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর উচ্চতম মর্যাদা হারিয়ে বঙ্গ দুশমনে পর্যবসিত হলেন। তার বিপর্যয়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রধানতঃ তিনটি উপকরণ মিশে আছে।

প্রথমতঃ সামরিকবাহিনীর প্রধান হওয়া সত্ত্বেও মুজিব সেনাবহিনীকে অবিশ্বাস করতেন। সেনাবাহিনীর এবং বাংলাদেশ আন্দোলনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে, এমন অনেক সামরিক অফিসারের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার কোনো সুযোগ তিনি ছাড়ছেন না। স্পষ্টঃই তাদের উপর তিনি গোয়েন্দাগিরি চালাতেন।

মুজিবের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অনুগত উচ্চ ট্রেনিংপ্রাপ্ত সুসজ্জিত ইউনিফরমধারী রক্ষীবাহিনীকে অস্ত্রেশস্ত্রে, বেতন-ভাতায়, ব্যয়-বরাদ্দে সামরিকবাহিনীর চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়া হতো। উভয়ের মধ্যে স্বার্থের অনেক সংঘাতেই মুজিব অন্ধভাবে রক্ষীবাহিনীকে সমর্থন করতেন।

অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, সেনাবাহিনী সম্পর্কে দীর্ঘদিনের সন্দেহ ও ভীতি থাকা সত্ত্বেও মুজিব গত বছর পাচার ও দুর্নীতি উচ্ছেদ অভিযানে সেনাবাহিনীকেই নিয়োগ করেছিলেন। তার এই রাজনৈতিক চাতুরি মারাত্মকভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ঠ হয়েছে।

এতোদিন সেনাবাহিনী সরকারের অবৈধ কার্যকলাপের কথা গল্প গুজব শুনেছে মাত্র। এবার তারা এর ব্যাপকতার মুখোমুখি দাঁড়াল। দুর্নীতি নির্মূল অভিযানে বাঁধা আসলো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে। এতে তাদের অসন্তোষ আরো বেড়ে গেল এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদের আক্রোশ নিবদ্ধ হল মুজিবের উপর।

সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুজিবের বিরোধের ফলে একটি ঘটনা ঘটে যাতে গত শুক্রবারের সামরিক অভ্যুত্থানের মুখপাত্র মেজর ডালিম জড়িত ছিলেন। এক বিয়ের অভ্যর্থনা

www.pathagar.com

মজলিশে "মুক্তিবাহিনী'র এই বীর যোদ্ধার পত্নীকে ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের প্রধান ও মুজিবের বিশ্বস্ত প্রিয়পাত্র গাজী গোলাম মোস্তাফার ভাই অপমান করেন। মেজর ডালিম প্রতিবাদ করলে মোস্তফার ভাই একদল গুন্ডা এনে সমবেত মেহমানদের সামনে ডালিম - দম্পতিকে বলপূর্বক উঠিয়ে মোস্তফার বাড়িতে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে অবিলম্বে তিনটি লরী বোঝাই তরুণ সিপাহী মোস্তফার বাড়ির উদ্দেশ্য ধাওয়া করে। গোলমাল আশংকা করে মোস্তফা মেজর ডালিম ও তার পত্নীকে নিয়ে মুজিবের বাসভবনে উপস্থিত হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই দু'পক্ষ মুখোমুখি হলে উত্তোজনার সৃষ্টি হয়। ডালিম-দম্পতিকে মুক্তি দিলেও মুজিব তরুণ অফিসারদের বিশৃংখলার" জন্য তীর ভর্ৎসনা করেন। এখানেই শেষ নয় ক'মাস পর মুজিব নয় জন অফিসারকে বরখাস্ত করেন এবং প্রশংসনীয় সার্ভিস রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও মেজর ডালিমকে মাত্র ২৮ বছর বয়সে অবসর বাধ্য করে। এই ভূতপূর্ব মেজরই গত শুক্রবার ভোরে মুজিবের "স্বৈরতন্ত্রের" অবসানের খবর ঘোষণা করেন।

মুজিবের পতনের দ্বিতীয় প্রধান কারণ হচ্ছে ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশ শাসনতন্ত্রে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেয়া। ইসলামের মর্যাদার এই অবমাননা অনিশ্চয়তাসূচক প্রমাণিত হয়েছে।

"এক হাজার মসজিদের শহর" বলে ঢাকা বরাবরই গর্ব করেছে এবং বাঙ্গালীরা ঐতিহ্যগতভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেয়ে বেশি ধর্মানুরাগী। অপরদিকে, বাঙ্গালী মুসলমানরা উপমহাদেশে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অবিচলিতভাবে সমর্থন করেছিল বলেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল।

এই পটভূমিতে মুজিবের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তম অংশকে আহত করেছিল। তাই নতুন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ বাংলাদেশকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা করে রাতারাতি জনসমর্থন লাভ করেছেন। গত শুক্রবার জুমা'র নামাজের জন্য কারফিউ উঠিয়ে দিলে মসজিদে এই জনসমর্থন অভিব্যক্ত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ মুজিব ক্রমেই জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন। আওয়ামী লীগের মোসাহেবরা তার চারদিকে এমন বেষ্টনী গড়ে তুলছিল যার ফলে জনসাধারনের সঙ্গে তার কোনো সংযোগ ছিল না।

স্পষ্টতঃ ই এই বিচ্ছিন্নতা চরমে পৌঁছল যখন এ বছর তিনি সংসদীয় গণতন্ত্র বিলোপ করে আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল ও রাশিয়ার একদলীয় ব্যবস্থার সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত শাসন পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন। মূলতঃ ব্যক্তিগত শাসন পাকাপোক্ত করার জন্যই তা' করা হয়েছিল। বাংলার মানুষ যারা তিন পুরুষ ধরে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছে তারা এটা বরদাস্ত করতে পারেনি।

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্যই প্রাক্তন পূর্বপাকিস্তান ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়েছিল এতদসত্ত্বেও মুজিব তার নিজের উদ্দেশ্য সাধনে অবিচালিত ছিলেন। পরিহাস এই যে, এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায়ও মুজিবের কথায়ই বাংলাদেশ শাসিত হয়েছে এবং তার কথাই ছিল দেশের আইন। এ ক্ষমতা ও মর্যাদা বাংলার মানুষ জাতিরজনককে সরল মনেই দান করেছিল। মুজিব যখন এ দান আনুষ্ঠানিকভাব ব্যক্তিগত করে নিতে চাইলেন তখনই তারা বিদ্রোহ করল। ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে তার উপর আঘাত আসল। আর কোনো পথ ছিল না। মুজিবকে বাঁচিয়ে রাখা ভয়ানক বিপজ্জনক হতো।

www.pathagar.com

শাসনতন্ত্র সংশোধনের ফলে

অমিত রায়, সানডে টেলিগ্রাফ

'তোরা যে যা বলিস ভাই, 'আমার সোনার হরিণ চাই'- দর্শনে বিশ্বাসী শেখ মুজিব নিজের অভীষ্ঠে পৌঁছার চেষ্টা করেছেন বার বার। একটি জাতির কি হলো, কি হচ্ছে, আর কি হবে সে চিন্তা তার ছিল না। তাই সব কিছু পায়, দলে তিনি চেয়েছিলেন কন্টকমুক্ত সিংহাসন। এ জন্য তিনি সংশোধন করেছিলেন শাসনতন্ত্র যা ছিল গণবিরোধী। ১৯৭৫ সালের ২৭ আগষ্ট লন্ডনের সানডে টেলিগ্রাফের অমিত রায়ের উপস্থাপনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেই সত্য।

বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান নিয়ন্তা হলো শহরের বাসিন্দা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদের সমর্থনই মুজিবকে নেতা বানিয়েছিল-ক্ষমতায় বসিয়েছিল। কিন্তু শাসনতন্ত্র সংশোধনের ফলে মুজিব তাদের সমর্থন হারিয়ে ফেলেন এবং সেদিন থেকেই নিজেকে অতীতের পাতায় তুলে দিয়েছিলেন।

চারদিকে চাটুকার পরিবেষ্টিত মুজিব সর্বব্যাপী গণঅসন্তোষ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বরং উল্টা "আমার জনগণ আমাকে ভালবাসে, আমি তাদের ভালবাসি" একথা আওড়িয়ে মিথ্যা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেয়েছিলেন। তার মেরুদণ্ডহীন সমর্থকরা তাকে বুঝিয়েছিল যে, অর্থনৈতিক দুঃখ-দুর্দশা, শিল্প-কারখানার ব্যবস্থা, অপরিমেয় মজুতদারি, চোরাকারবার এবং ক্রমাবনতিশীল আইন-শৃংখলাজনিত সমস্যাদি মুজিবী খ্যাতির মুখে কিছুই নয়।

সমস্যার মোকাবিলা না করে মুজিব গুন্ডা - বদমাইশ নিয়ে ২৫ হাজার লোকের রক্ষীবাহিনী খাড়া করেছিলেন, যাতে সেনাবাহিনী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস না পায়।

সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রথম অসন্তোষ দেখা দেয় তখন যখন ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসাররা পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে দেখতে পেলেন যে, তাদের অধীনস্থ অফিসাররা কয়েক ধাপ ডিংগিয়ে কর্তা হয়ে বসে আছেন। গত বছর এই অসন্তোষ প্রায় প্রকাশ্য বিদ্রোহের পর্যায়ে এসে পড়েছিল। সেনাবাহিনীকে মজুতদার ও চোরাকারবারী খুঁজে বের করার কাজে নিয়োগ করা হলো। কিন্তু তাদের অনুসন্ধানের ফলে যখন স্বয়ং মুজিবের ঘনিষ্ঠজনেরা জড়িত বলে প্রমাণিত হতে লাগল তখন তাড়াতাড়ি সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে পাঠিয়ে সবকিছু ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হলো।

মুজিবের এসব "ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন হলেন গাজী গোলাম মোস্তাফা, যিনি "বাংলাদেশের বড় চোর" বলে কুখ্যাত। দুনিয়ার মানুষ বাংলাদেশের দুঃস্থজনের জন্য

www.pathagar.com

রেডক্রসের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সাহায্যসামগ্রী পাঠিয়েছে, আর বাংলাদেশের রেডক্রসের প্রধান হিসাবে গাজী গোলাম মোস্তফা সেসব আত্মসাৎ করে ব্যক্তিগত ধন সম্পদ বানিয়েছেন।

মোস্তাককে রেশন বন্টন কমিটিরও প্রধান বানানো হয়েছিল। রেশন দোকানের মালিকরা তারই প্রত্যক্ষ মদদ দিয়ে রেশনের খাদ্যসামগ্রী কালোবাজারে বিক্রি করে দু'হাতে টাকা লুটেছে এবং এ কালো টাকার মোটা অংশ তারা নজরানা হিসাবে মোস্তফার পকেটে তুলে দিয়েছে। শুধু তাই নয় টাকা ইমপ্রুভমেন্ট এলটমেন্ট কমিটির প্রধান এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি বোর্ডের সদস্য হিসাবেও তিনি খালি জমি ও বাড়ি বিলি-বন্দোবস্ত ও নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এসবের বিনিময়ে তিনি ঘুষ নিয়েছেন দু'হাতে। উপরন্তু ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের প্রধান হিসাবে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির উপর তিনি কর্তৃত্ব খাটিয়েছেন। মুজিবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন আইনের উর্ধ্বে।

ব্যাংক-এ ডাকাতি করে ডাকাতরা পালিয়ে যাচ্ছিল, পুলিশ গুলি ছুঁড়ল। দেখা গেল স্বয়ং মুজিবের বড় ছেলে কামাল আহতদের মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতি সারাদেশে ৫৩টি পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং শুধুমাত্র ৪টি পত্রিকা চালু রাখা হয়েছে। এ চারটি পত্রিকার একটি হলো মুজিবের ভাগিনা শেখ ফজলুল হক মণির মালিকানাধীন 'বাংলাদেশ টাইমস'।

বিগত চার বছরে শেখ মুজিবের আপন ভাই শেখ আবু নাসের যতোবার ঢাকা থেকে স্বীয় আদি ব্যবসা কেন্দ্র খুলনায় গিয়েছেন তার চেয়ে বেশি বার লন্ডনে এসেছেন। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সম্পাদক জিল্লুর রহমান লন্ডনে বেড়াতে আসেন। ফেরার সময় তিনি ২৩টি বড় বড় বাক্স বোঝাই করে সওদা নিয়ে গেছেন।

অপরদিকে, মুজিব তার সামান্যতম সমালোচনাকারীকে কোনোরূপ বিচার-বিবেচানার তোয়াক্কা না করে নাস্তানাবুদ করেছেন। এমনকি এসব মৃদু সমালোচনাকারীর অতীত অবদানটুকুও বিবেচনায় আনা হয়নি। ১৯৭১ সালে একটা গোটা ট্রেন বোঝাই করে টাকা-পয়সা নিয়ে তৎকালীন পাবনার ডেপুটি কমিশনার নূরুল কাদির খান কলিকাতার চলে এসেছিলেন। এ টাকা তৎকালীন নির্বাসিত সরকারের অনেক কাজে এসেছিল। কিন্তু কূটনীতিবিদদের এক মজলিশে কথায় কথায় সামান্য বিরূপ মন্তব্য করায় তাকে পর্যটন করপোরেশনে অপসারিত করা হয়।

www.pathagar.com

স্বৈরাচারী শাসনই দায়ী

লুই সিমনস, ওয়াশিংটন পোস্ট

মুখে গণতন্ত্রের কথা থাকলেও শেখ মুজিব মনেপ্রাণে ছিলেন স্বৈরাচারের প্রতিভূ। ১৯৭৫ সালের ১৮ আগষ্ট ওয়াশিংটন পোষ্ট পত্রিকায় লুই সিমনস শেখ মুজিবের পতনের কারণ হিসেবে সেই বিশ্লেষণই উপস্থাপন করেছেন।

"বাংলার জ্বলন্ত চুলায় হাত ঢোকাবার জন্য একদিন মিসেস গান্ধীকে অনুশোচনা করতে হবে"– গত বছর এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর এ ভবিষ্যদ্বাণী যে এভাবে ফলে যাবে তা হয়তো স্বয়ং ভুট্টোও কল্পনা করেননি। হঠাৎ এই গতি পরিবর্তন শুধু মিসেস গান্ধীকে নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নকেও বিচলিত করতে বাধ্য। এতোদিন তারা চীনকে আগলে রাখার প্রয়াসে বাংলাদেশকে ব্যবহার করে এসেছিলেন।

যদিও এ অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ হিসেবে শেখ মুজিবের স্বৈরাচারী শাসন, তার অযোগ্যতা এবং দুর্নীতিপরায়ণতার কথা তুলে ধরা হয়েছে, তবু প্রথম থেকেই দিল্লী-মস্কোর সাথে বেশি মাখামাখির জন্য জনগণ মজিবকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।

অতীতে যেমন দুঃখ-দুর্দশার জন্য বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানকে দায়ী করেছে, তেমনি বাংলাদেশ সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যেই অর্থনৈতিক শোষণ চালু করার জন্য ভারত সরকার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীকে অভিযুক্ত করছে। পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলে উদ্ভূত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে ঘাত-প্রতিঘাতের জন্ম দিয়েছে, তারই ফল হচ্ছে শেখ মুজিবের পতন ও মৃত্যু।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংঘর্ষ মিসেস গান্ধীকে তার বিবদমান প্রতিবেশীকে ঘায়েল করার এক মোক্ষম সুযোগ এনে দিয়েছিল। সরাসরি পাক-ভারত যুদ্ধ লাগার আগে নয় মাস বাঙ্গালী গেরিলারা সক্রিয় ছিল বটে, কিন্তু ভারতই তাদের অস্ত্রশস্ত্র যুগিয়েছে। ভারত কর্তৃক সরাসরি পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযান পাশ্চাত্য জগতে সমালোচনার জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু বাঙ্গালীদের স্বাধীনতা স্পৃহা সহজেই সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দেয়।

ইসলামাবাদ, পিকিং এবং ওয়াশিংটন তাড়াতাড়ি বাংলাদেশের নতুন সরকারের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা করবে বলে মনে হয়। পাকিস্তান যে তার এককালীন পূর্বাঞ্চলের সাথে একটি কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী তার প্রমাণ এই যে, ইসলামাবাদ বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দান করেছে।

অবশ্য বাংলাদেশের স্বার্থের দিক থেকে ভুট্টো সরকারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন অনেক বেশি লাভজনক হবে। স্বাধীন হবার ফলে বাংলাদেশ শুধু গুরুত্বপূর্ণ একটি অভ্যন্তরীণ বাজারই হারায়নি রপ্তানী বাণিজ্য পরিচালনার উপযোগী একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা এবং প্রধান প্রধান আমদানী পণ্যের প্রধান উৎসব হাতছাড়া করেছে।

www.pathagar.com

শেখের ট্রাজেডী

হার্ভে স্টকউইন, ফার ইস্টার্ণ ইকনমিক রিভিউ

আক্ষরিক অর্থেই সুশিক্ষায় অভাবী শেখ মুজিবের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার লেশমাত্রও ছিল না। ছিল ক্ষমতান্ধতা। আর সে অন্ধত্বের কারণেই তার চোখে পড়েনি নির্মম সত্যগুলো মিথ্যার আবরণে শেখ মুজিবের উত্থানের মধ্যেই উপ্ত ছিল পতনের বীজ। এই উপলব্ধির অভাবই ছিল মূলতঃ তার ট্রাজেডী। শেখের যাবতীয় অন্ধত্বের বিভাজন করেছেন হার্ভে স্টকউইন তার শেখের ট্রাজেডী নিবন্ধে। ১৯৭৫ সালের ২৯ আগষ্ট। হংকং থেকে প্রকাশিত ফার ইষ্টার্ণ ইকনমিক পত্রিকায় এ নিবন্ধে।

বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায়ই যে প্রলয়ংকারী ঘুর্ণিবার্তা বাংলাদেশের উপর নেমে আসে, শেখ মুজিব ছিলেন তারই মানবীয় রূপ। রাজনৈতিক মঞ্চে তার দীপ্ত পদচারণার সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও আবেগের উচ্ছ্বাসে সবকিছু তলিয়ে গেল। আজ মুজিব মঞ্চ থেকে চিরকালের মতো সরে গেছেন, কিন্তু দেশকে রেখে গেছেন রিক্ত, নিঃসহায় করে। তার আমলে কি ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার চূড়ান্ত হিসাবে কেবল এখনি শুরু হতে পারে।

মূলতঃ শেখ ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি ঘটনাবলীর পশ্চাতে এগিয়ে গেছেন। বিক্ষোভকারীর সহজাত প্রবৃত্তি নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। বিক্ষোভকারীর ভূমিকা থেকে নিজেকে কখনো তিনি বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি এবং পরিণতিতে বিক্ষোভকারীর মৃত্যুকেই তিনি বরণ করে নিয়েছেন।

শেখের মধ্যে তার গুরু সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক সূক্ষ্মতা বা চাতুর্য ছিল না। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীরূপে সোহরাওয়ার্দী পৃথক বাঙ্গালী জাতীয় রাষ্ট্রের কথা তুলেছিলেন। ২৪ বছর পর শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সেই বাংলাদেশের সৃষ্টি হলো। কিন্তু সারাজীবন নেতিবাচক রাজনীতি করার ফলে নতুন জাতিকে বাস্তব কিছু দেবার সামর্থ্য তার হলো না। এই রায় কর্কশ শোনাবে। হয়তো আংশিকভাব এই কঠোর মন্তব্যের উদ্ভব হয় ১৯৫৭ সালে যখন এক কাদানে গ্যাসসিক্ত পরিবেশে মুজিবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। তিনি তখন পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রিসভার সদস্য (আমার যদি ঠিক স্বরণ থাকে, তিনি তখন বিচার বিভগীয় মন্ত্রী ছিলেন)। আওয়ামী লীগের মোকাবিলা করার জন্য তখন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করা হচ্ছিল। সিন্ধু প্রদেশ থেকে আসলেন জি এম সৈয়দ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে আসলেন খান আবদুল গফফার খান। ন্যাপের অপর একজন প্রতিষ্ঠাতা হলেন মাওলানা ভাসানী। ভাসানীকে শেখ মুজিব বরাবরই প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখেছেন। কেননা, ভাসানীই ছিলেন তার একমাত্র সমতুল্য গণভক্তা।

www.pathagar.com

সকলেরই জানা ছিল যে, ঢাকার ন্যাপের এই উদ্বোধনী সভা পণ্ড করতে শেখ মুজিব মনস্থ করেছেন এবং ঠিকই যেই মাত্র ন্যাপের উৎসাহী সমর্থকরা পল্টন ময়দানে জমায়েত হতে লাগল, অমনি শেখের ভাড়াটিয়া গুন্ডারা গোলযোগ সৃষ্টি করতে শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারি করে সভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাদানে গ্যাস নিক্ষেপ করতে লাগল।

পাকিস্তানী সাংবাদিকদের কাছ থেকে সম্যক অবহিত হয়ে অল্পকাল পরে অনুষ্ঠিত এক প্রেস কনফারেন্স-এ আমি শেখকে প্রশ্ন করলাম, গত রাতে ঢাকার প্রধান সিনেমা হলের পিছনে তিনি গুন্ডাদের ঠিক কি বলেছিলেন? তিনবার প্রশ্ন করার পরও শেখ আমার প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করলেন এই বলে যে, তিনি আমার ইংরেজী বুঝতে পারেননি। এই ঘটনা ও অন্যান্য ঘটনা থেকেও শেখের বিকৃত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও একনায়কসুলভ মনোভাব কিছুসংখ্যক চিন্তাশীল বাঙ্গালীর কাছে বরাবরই পরিষ্কার ছিল। তবে বিগত কয়েক মাসেই অধিকসংখ্যক লোকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দীর্ঘকাল ঘটনাপ্রবাহ শেখের অনুকূলে ধাবিত হয়ে উপরোক্ত উপলব্ধি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বাঙ্গালীদের হতাশার মধ্যে আইউব আমলের শেষের দিকে বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রবণতা বেড়ে গেল। ইসলামাবাদও শেখকে বাঙ্গালীদের অধিকার প্রধান প্রবক্তা হিসাবে প্রতিভাত হবার উত্তম সুযোগ করে দিলো। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের সাইক্লোনজনিত বিপর্যয়ের পর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি নির্লজ্জ অবহেলা তার একটি উদাহরণ।

বিপর্যয়ের ভয়াবহতার মধ্যে মাওলানা ভাসানী প্রথম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কথা বলেন। শেখ মুজিবও পিছিয়ে পড়ার লোক নন। মাওলানা ভাসানীর বিবৃতির পরদিনই তিনি সাইক্লোনকে ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল সাফল্যের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করলেন। তারপর থেকে সবাই দেখতে পেল যে, পাকিস্তানের ভাঙ্গন অবশ্যম্ভাবী। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা অবশ্য এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের জন্য সূক্ষ্ম পদক্ষেপ নিতে শেখ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য সম্ভাবনাও তেমন ছিল না। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, জুলফিকার আলী ভুট্টো সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সন্দেহ ছিল, যেমন ছিল শেখ সম্পর্কে কিছুসংখ্যক বাঙ্গালীর।

ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। শেখ মুজিব তা ব্যাহত করতে পারতেন। যারা তাকে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক সফর করার উপদেশ দিয়েছিলেন, তাদের কথা না শুনে তিনি ভুট্টোর হাতেই ধরা দিলেন। বৃহত্তর

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের ধারণা এবং আত্মবিশ্বাস কোনোটাই শেখের ছিল না। প্রচলিত মতের বিরোধী হলেও শেখকে যারা জানতেন তাদের কেউ কেউ জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি বিশ্বাস করতেন না পাকিস্তানের ভাঙ্গন অবশ্যম্ভাবী ছিল। দেশের ভাঙ্গনকে ঠেকাবার কোনো পদক্ষেপ নিতে তিনি যেমন ব্যর্থ হয়েছেন, তেমনি ব্যর্থ হয়েছেন এমন কোনো সদিচ্ছা দেখাতে যা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ২৫শে মার্চের আকস্মিক অভিযান নিবৃত্ত করতে পারতো। এরপর যে ট্রাজেডী শুরু হলো তার জন্য পাকিস্তান সামরিকবাহিনী ও ভুট্টো নিঃসন্দেহে দায়ী। তাহলেও বলতে হবে যে, শেখের বাগ্মিতার ফলেই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও রক্তপাত শুরু হয় এবং তাতেই পশ্চিম পাকিস্তানের একান্ত অনুগতরা নৃশংস অভিযান আরম্ভ করার অজুহাত পায়।

১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহ শেখকে জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছে দিলো। কিন্তু যে আশা-আকাঙ্ক্ষা তিনি উদ্দীপ্ত করেছিলেন, তা কার্যতঃ পূরণ করার তার সামর্থ্য ছিল না। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট হলেন। তারপর প্রধানমন্ত্রী এবং এ বছরের জানুয়ারি মাসে আবার প্রেসিডেন্ট হলেন শেখ ক্ষমতা ও খেতাব নিয়ে খেলা করেছেন, বাংলাদেশের আর্থিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার জন্য আদৌ কিছু করেননি। বাহ্যতঃ সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার কর্তৃত্ব ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছিল।

চাকা সম্পুর্ণ ঘুরে গেল পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রাক্ষীতিমুক্ত সেই দিনগুলোর জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ পেলো। জনৈক বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী তিক্ততার সাথে বললেনঃ ১৯৭২ সালে শেখকে কেন ভুট্টো ছেড়ে দিয়েছিল, জানেন? ভুট্টো সুচতুর। তিনি জানতেন যে, মৃত মুজিবের চেয়ে জীবিত মুজিবকে নিয়ে বাংলাদেশে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আর যাই হোক মুজিবের স্মৃতি হয়তো বাংলাদেশকে একটা কিছু দিতে পারত।"

শেখ কোনোকিছুই করতে পারলেন না, তার কয়েকটি কারণ রয়েছে ঃ প্রথমত ঃ ক্ষমতা সম্পর্কে তার অত্যধিক নিজস্ব মতবাদ ছিল। দ্বিতীয়তঃ তার মধ্য একটা গভীর হীনমন্যতার ভাব (ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স) ছিল, যা আংশিকভাবে তার শিক্ষার অভাববোধ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। তৃতীয়তঃ শেখ কখনই বাংলাদেশের সুশিক্ষিত তর্কপ্রিয় বুদ্ধিজীবীদের কিংবা বিজ্ঞ সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন না। এর ফলে শেখ ও বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা ব্যবধান বিদ্যমান ছিল। কোনো পক্ষই তা দূর করার চেষ্টা করেননি। 'বুদ্ধিজীবীদের প্রয়োজন ছিল শেখের, যেহেতু তার বিপুল জনসমর্থন। আর শেখেরও প্রয়োজন ছিল বুদ্ধিজীবীদের, কেননা একটা দেশের সমূহ সমস্যাবলী মোকাবিলা করার সাধ্য তার ছিল না।

গত জানুয়ারি মাসে একচ্ছত্র ক্ষমতা দখল করে বুদ্ধিজীবীদের আক্রমণ করে, তিনি তাদেরকে আরো দূরে ঠেলে দিলেন। পরবর্তী ঘটনাবলী-বরং বলা চলে ঘটনাবলীর

www.pathagar.com

অভাব আরো স্পষ্ট করে তুললো, মুজিব কতখানি জনসংযোগ হারিয়ে ফেলে ছিলেন। তার একচ্ছত্র ক্ষমতা আত্মম্ভরিতায় রূপ নিলো বাংলাদেশের অপ্রতুল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উপায়ে পরিণত হলো না। বিপুল সময় ব্যয় করে PRESS- কে পঙ্গু করা হলো। শেখের ক্রটি বিচ্যুতির কথা বলতে গিয়ে যারা ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্তও শেখের মিত্র ছিলেন, মে অথবা জুন মাস নাগাদ তারা শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়লেন। শেখের একটানা চাটুকারিতা নিত্যদিনের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল। ক্রমবর্ধমান পুষ্টিহীনতা ও মুদ্রাস্ফীতির ব্যাপারে চাটুকারিতার কিছুই ছিল না। অনেকেই একমত যে, শেখের যা করণীয় ছিল তা এই যে, সামান্যতম সাফল্যের মাধ্যমে আরোও একটু আশা জাগিয়ে তোলা। কিন্তু তিনি যে উপায় বেছে নিলেন, তা তার ব্যর্থতাকেই সুনিশ্চিত করে দিল। এরপর যা অবশিষ্ট রইল সেটা হলো তার ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি। কিছুসংখ্যক লোককে এই ভাবমূর্তি টেনে নিয়ে গেল বিপর্যয়ের মুখে। জনসাধারণের মধ্যে তার অনুগামী অনেক। এরা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। কেননা, মুজিবের সম্মোহনীশক্তি এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, যা বহুবিধ জটিল সমস্যার মধ্যেও কোনো প্রকার শুণ্যতা পূরণ করতে পারতো। তার নিজের ক্রটি-বিচ্যুতির জন্যই সে শূণ্যতা আরো বেড়ে গেল।